দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৯ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।। ৮ ফাল্গুন - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
দুশো বছরের ঐতিহ্য এবং অবক্ষয়
পৃষ্ঠা : ১১

ট্রাম্পের নয়া অভিবাসন নীতি
দুই বিশ্ব মুখোমুখি
পৃষ্ঠা : ১৪

স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইতিহাস বিকৃতি
এক জঘন্য অপরাধ
পৃষ্ঠা : ২৯

আমেরিকার নয়া অভিবাসন নীতি

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ট্রাম্প-কার্ড

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ৮ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২০ ফেব্রুয়ারি - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

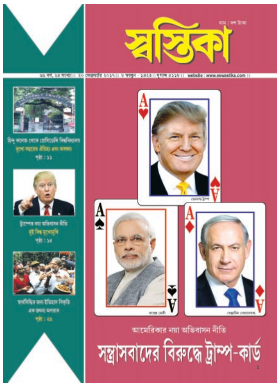

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

খোলা চিঠি : খারাপ মোদীর ভালো দিক
□ সুন্দর মৌলিক □ ৯

নোট বাতিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ যে মিথ্যা রাজ্য বাজেটেই তা স্পষ্ট □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় — দুশো বছরের ঐতিহ্য এবং অবক্ষয় □ ড: প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় □ ১১

ট্রাম্পের নয়া অভিবাসন নীতি : মুখোমুখি দুই বিশ্ব
□ ড: অচিন্ত্য বিশ্বাস □ ১৪

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ট্রাম্প কার্ড : ভারত-আমেরিকা-ইজরায়েল □ প্রণয় রায় □ ১৭

দেবাদিদেব শিবঠাকুর □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ২১

গীতার ধর্ম নিবৃত্তিমূলক, ত্যাগই তার মর্মকথা
□ সুনীল কুমার দাস □ ২৩

একেবারে স্বচ্ছ পরিকল্পনা ঋদ্ধ এই বাজেট
□ চেতন ভগত □ ২৭

স্বার্থসিদ্ধি ও প্রগতিশীল সাজার জন্য ইতিহাস বিকৃতি এক জঘন্য অপরাধ □ ড: নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ২৯

ব্রহ্মা নারদ সংবাদ : বিষয়— অসহিষ্ণুতা বনাম অসহিষ্ণুতা
□ কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □
অন্যরকম : ৩৩ □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫-৩৬** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮**□ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □
প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা ভাবনা

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মদিনটিকে স্মরণে রেখে তাঁর প্রদর্শিত সেবা-ভাবনার কথা আলোচনা করেছেন ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত। সেই সঙ্গে থাকছে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার।

।। দাম একই থাকছে - ১০.০০ টাকা মাত্র।।

প্রকাশিত হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ

খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহ—এই তিনটির পর মানুষের জীবনে সব থেকে বড় প্রয়োজন হইল শিক্ষা। এই কারণে দেশের সরকারও শিক্ষানীতি বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক সংশোধনের জন্য বিধানসভার চলতি অধিবেশনে ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) বিল ২০১৭ পাশ করাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে অর্থনৈতিক অনিয়ম, অধ্যাপকদের উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতা, অবসর ও পুনর্নিয়োগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশোধিত শিক্ষা বিলটি গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের যুক্তি হইল—কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চলিয়া থাকে জনসাধারণের অর্থে। সেখানে ঠিকঠাক কাজ না হইলে সরকার হস্তক্ষেপ করিবেই। কেননা সরকার জনগণের প্রতিনিধি।

অন্যদিকে বিধানসভায় সদ্য গৃহীত এই উচ্চশিক্ষা বিলটিকে বিরোধীদলগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার হরণের রূপান্তর বলিয়া মনে করে। এই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে তাঁহারা আন্দোলনের পথে যাইবেন বলিয়া হুমকিও দিয়াছেন। ঘটনা হইল, এই বিলটি গৃহীত হইবার সময় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের বিধায়করা বিধানসভায় অনুপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জীর বক্তব্য—উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যাপক সংস্কার ও শিক্ষকদের কল্যাণের জন্যই রাজ্য সরকার এই বিল পাশ করাইয়াছে। আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্তশাসনের নামে আর্থিক অনাচার হইত। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক হিসাবের অডিট হয় নাই। শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ লইয়া দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি ইতিমধ্যেই সংবাদের শিরোনামে আসিয়াছে। এমনকী শিক্ষার মান কমিয়া যাওয়ায় ন্যাকের বিচারে সেন্ট জেভিয়ার্স এবং প্রেসিডেন্সির তুলনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল খারাপ। নূতন এই আইনের বলে এই দুর্নীতি রোখা সম্ভব হইবে। শিক্ষকদের পি এফের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পড়িবে। শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্য অস্বীকার করা যায় না। নিযুক্তির প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ও মেধা তথা যোগ্যতার ভিত্তিতেই হওয়া দরকার। অন্য সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষকদের তুলনা করা যাইতে পারে না। সম্ভবত এই কারণেই শিক্ষকদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে বিল হইতে 'বায়োমেট্রিক' শব্দটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষকদের বিবেকের উপরই বিষয়টি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষকেরা সমাজ গড়িবার কারিগর। তাই শিক্ষা হইল সেবা। সেখানে সময়ানুবর্তিতার বিষয়টি তাই অবশ্যই পালনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যের ৪০টি কলেজ এবং বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া উপস্থিতির হার দেখা হইতেছে।

এই রাজ্যে শিক্ষায় রাজনীতিকরণ পুরাতন ব্যাধি। বামফ্রন্ট আমলে রাজ্যবাসী ইহার কদাকার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর যুক্তিকে স্বীকার করিয়াও তাই আশঙ্কা থাকিয়া যায় যে কলেজ পরিচালন সমিতি হইতে অধ্যাপকদের নিযুক্তি ও স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে সরকারি ও রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদগুলিতে সরকারের পছন্দের লোক বসাইবার পথ ইহাতে সহজ হইবে। কোথাও কোনো ভ্রষ্টাচার দেখিলে প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই তাহা নিয়ন্ত্রণের উপায় ছিল। রাজ্য সরকার তাহা এড়াইয়া নূতন যে সংশোধনী আইন পাস করিয়াছে তাহাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকিয়াই যায়।

সুভাষিতম্

সত্যবাদী লভেতায়ুঃ অনায়াসমথার্জবম্।

অক্রোধনোঽনসূয়শ্চ নিবৃত্তিং লভতে পরাম্।।

যিনি সর্বদা সত্য কথা বলেন, বিনম্র ও সরল স্বভাবের হন, তিনি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন। যিনি অক্রোধী ও ঈর্ষাশূন্য তিনি ইহলোকে সুখী এবং পরলোকে পরমানন্দ লাভ করেন।

সাধ্বী প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহের বেকসুর মুক্তি-সংক্রান্ত নিম্ন আদালতের রায় চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে আপিল করার সম্ভাবনা খারিজ হয়ে গেল। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগ এক চিঠিতে রাজ্য সরকারকে জানিয়েছে সাধ্বীর বিরুদ্ধে কোনো তথ্য প্রমাণ তাদের কাছে নেই। তাই আপিল করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সরকারি প্লিডার গিরিশ সাঙ্গী বলেন, 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, কোনো প্রমাণই নেই। সাক্ষীরা সকলে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে গেছে। আমি সরকারকে জানিয়েছি কোনো উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ আমাদের কাছে নেই।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুনীল যোশী হত্যা মামলায় সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২৯ ডিসেম্বর ২০০৭, বাড়ির কাছেই চুনা খাদানে সুনীল যোশীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। সুনীল যোশী যখন কংগ্রেসের এক জনজাতি নেতা ও তার ছেলেকে খুন করে পালিয়ে যাচ্ছিল তখনই সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ তাকে হত্যা করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। 'এ বছর ১ ফেব্রুয়ারি দিওয়াসের ফার্স্ট অ্যাডিশনাল সেশন জজ হত্যা-মামলা থেকে সাতজন অন্য অভিযুক্ত-সহ সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহকে নিরপরাধ ঘোষণা করে বেকসুর মুক্তি দেন। কিন্তু রায় ঘোষণার একদিন পর সুনীল যোশীর শ্যালিকা সাধ্বীর মুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগের এই উদ্যোগ। ঘটনায় নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ বলেন, 'আমি হিন্দু ধর্মের প্রতি দায়বদ্ধ জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন এক সন্ন্যাসিনী। দেশবিরোধী কোনো কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে মামলায় আমাকে জড়ানো হয়েছিল তাতে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।'

প্যারালিসিসে আক্রান্ত সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং।

পাকিস্তানে তৈরি জালনোট বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই! ভারতে বিমুদ্রীকরণ ঘোষিত হবার তিন মাসের মধ্যেই জাল ২০০০ টাকার নোট ধরা পড়ল। অভিযোগ, এই নোট তৈরি হয়েছে পাকিস্তানে আর ভারতে ঢুকেছে বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে। বিমুদ্রীকরণ ঘোষিত হবার পর থেকে কালোটাকা উদ্ধার করতে সারা দেশে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান হয়েছে। জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এন আই এ) এবং বিএসএফের এমনই এক যৌথ তল্লাশিতে গত ৮ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ থেকে আজিজুর রহমান (২৬) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী তার কাছে পাওয়া গেছে ২০০০ টাকার ৪০টি জালনোট।

তদন্তকারী অফিসারদের আজিজুর জানিয়েছে, এইসব নোট পাকিস্তানে ছাপা হয়েছে এবং পাকিস্তানের গুপ্তচর-সংস্থা আইএসআই-এর মাধ্যমে তার হাতে এসে পৌঁছেছে। আরও জানা গেছেন প্রতিটি ২০০০ টাকার দাম ৪০০-৬০০ টাকা। এই দাম মেটাতে হয় আসল টাকায়।

এন আই এ সূত্রের খবর, নতুন ২০০০ টাকার নোটে ১১টার মধ্যে ১৭টি নিরাপত্তা-সূচক নকল করতে সমর্থ হয়েছে জালনোটের কারবারিরা। নকল করা সূচকগুলির মধ্যে রয়েছে, নোটের স্বচ্ছ অংশ, জলের দাগ, অশোকস্তম্ভ, বাঁদিকে লেখা '২০০০'-এর সংখ্যাগুলি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গভর্নরের স্বাক্ষর-সহ তাঁর প্রতিশ্রুতি-পত্র, দেবনাগরী হরফে লেখা টাকার অঙ্ক ইত্যাদি। সেই সঙ্গে চন্দ্রায়ণের প্রতীক, স্বচ্ছ ভারতের লোগো এবং নোট মুদ্রণের বছরও জাল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে জালনোটের স্মাগলাররা অল্প সংখ্যায় ২০০০ ও ৫০০ টাকার নোট ভারতের বাজারে চালাবার চেষ্টা করেছিল। তার জন্য গত ২২ জানুয়ারি ও ৪ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় পুলিশ মালদহের কালিয়াচকের বাসিন্দা পিয়ারুল শেখ এবং দিগম্বর মণ্ডল নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বিমুদ্রীকরণের পর মুর্শিদাবাদ-মালদহের জালনোটের কারবার একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যপ্রশাসনের নির্লজ্জ মুসলমান-তোষণ এবং শিথিল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সুযোগে আবার তা মাথাচাড়া দিচ্ছে।

রিজিজুর সত্য ভাষণকে ঘিরে অরুণাচলকে অশান্ত করতে চাইছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দোষের মধ্যে তিনি খালি নির্ভেজাল সত্যটা বলে ফেলেছিলেন— 'ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, কারণ হিন্দুরা অন্যদের ধর্মান্তরিত করে না। কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে অন্যান্য দেশের তুলনায়।' তিনি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরণ রিজিজু। রিজিজুর এই সত্যভাষণ ঘিরেই দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে কংগ্রেস সহ-বিরোধীরা। পরিস্থিতি ভয়াবহ করে তুলে অরুণাচল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সরাসরি মন্তব্য করেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নাকি অরুণাচল প্রদেশকে হিন্দু রাজ্যে পরিণত করার চক্রান্ত করছে। কংগ্রেসের এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের জেরে দেশজুড়ে তুমুল সমালোচনার ঝড় উঠেছে। রিজিজু এক পালটা টুইটে কংগ্রেসকে এধরনের মন্তব্য হতে বিরত থেকে অরুণাচল প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল আশঙ্কা করছেন কংগ্রেস পুরো বিষয়টি নিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরার খেলায় নেমে পড়লে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে অরুণাচলে। তাঁরা এও মনে করেন যে রিজিজুর তথ্যে কোনো ভুল নেই। বিদেশি অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে কিছু সংগঠন হিন্দু জনজাতিদের ধর্মান্তরিত করে তাদের দেশবিরোধী কর্মে ব্যবহার করছে। বিরোধীরা ভোটের স্বার্থে রিজিজুর মন্তব্যে রঙ লাগিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। রিজিজু তাঁর এক টুইটে দলীয় আদর্শ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে তাঁর দল সকল ভারতবাসীকে এক দেশ এক জাতির তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখে। তাই সব উপাসনা পদ্ধতিকে সম্মান জানায়। সুতরাং অরুণাচল প্রদেশকে উপাসনা পদ্ধতির নিরিখে ধর্মান্তরিত করা নরেন্দ্র মোদী সরকার পক্ষে অসম্ভব। এবং কংগ্রেসের এধরনের প্রচার যে কেবল বিভাজনের রাজনীতিকে প্ররোচিত করার লক্ষ্যেই সে কথাও জানিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। সমর বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা কংগ্রেসের হঠকারী রাজনীতির সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করবে চীনও। আর তাদের মদত জোগাতে এদেশের কমিউনিস্টরা তো সদা প্রস্তুত। কূটনীতিকদের আরও আশঙ্কা জাগাচ্ছে এই বিষয়টিই।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, স্বস্তিকা পত্রিকার ৮ পৃষ্ঠায় সংবাদ প্রতিবেদন বিভাগে 'তিস্তা শিতলওয়াড়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ' সংবাদে তিস্তা শিতলাওয়াড়ের স্বামীর নাম ভুলবশত 'আনন্দ শিতলওয়াড়' লেখা হয়েছে। হবে জাভেদ আনন্দ্। উল্লেখ্য, তিস্তার স্বামী একজন মুসলমান।

ভারত-বিরোধী রিপোর্ট প্রকাশ করায় মার্কিন সংস্থাকে দুষল হিন্দু-আমেরিকান সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-বিরোধী প্রতিবেদন ছাপানোর ঠিকা নেওয়ায় হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের তোপের মুখে পড়লো ইউনাইটেড স্টেটস কমিশন ফর ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়স ফ্রিডম বা ইউ এস সি আই আর এফ। হিন্দু-আমেরিকান সংগঠনের সূত্রে খবর পাকিস্তানি লেখক ইকতিদার চিমা ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও দলিতরা ভারতে নির্যাতিত ও নিপীড়িত এই মর্মে অসত্য তথ্যভর্তি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আরও জানা যাচ্ছে যে জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তান যে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে, সে ব্যাপারেও তাত্ত্বিক সমর্থন রয়েছে চিমার লেখায়। অথচ ইসলামি মৌলবাদীদের মদতে যে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে তিন লক্ষাধিক হিন্দু পণ্ডিতকে ঘরছাড়া করা হয়েছে সে বিষয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করা হয়নি। শুধু কাশ্মীরই নয়, পঞ্জাবকেও টার্গেট করেছে চিমা। ভারতবর্ষে শিখ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই যেখানে পৃথক শিখ রাজ্য খালিস্তানের দাবিকে নাকচ করেছে, সেই খালিস্তানি আবেগকেও সুড়সুড়ি দিয়েছে চিমা। সূত্রের খবর, ইতিপূর্বে ১৯৮০-র দশকে এই খালিস্তানি আবেগের জন্য যে পঞ্জাবে হাজার হাজার পঞ্জাববাসীর মৃত্যু হয় তাতে ভর করেই সানফ্রান্সিসকো শহরে এক শিখসমাবেশে বক্তব্য রাখে সে। এমনকী ভারত ও ইংল্যান্ডে নিষিদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বব্বর খালসার হয়েও আওয়াজ তোলে চিমা। এইরকম একটি জঘন্য প্রতিবেদনের প্রকাশ হওয়া ইউ এস সি আই আর এফের মতো একটি মার্কিন সরকারি সংস্থা, যারা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারতকে 'কান্ট্রি অব্ পার্টিকুলার কনসার্ন ওয়াচ লিস্ট' বা 'টায়ার-২'-এর মধ্যে অন্তর্গত করেছে আফগানিস্তান, তুরস্ক, রাশিয়া ও অন্যান্যদের সঙ্গে, তাদেরকে মানায় না বলে হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন উল্লেখ করেছে। ইউ এস সি আই আর এফের সুহাগ শুক্লা তাঁর ব্লগে লিখেছেন— চিমা তাঁর বইয়ের প্রকাশক হিসেবে কেবল ইউ এস সি আই আর এফের নামটি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছে। অবশ্য এর জন্য ইউ এস সি আর এফকে সতর্ক না থাকার জন্যও তাদের কঠোর নিন্দা করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ভারত বিরোধী জঘন্য প্রতিবেদনটির লেখক ইকতিদার চিমা ইংল্যান্ডের বার্মিংহামের ইনস্টিটিউট ফর লিডারশিপ অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর ডিরেক্টর। বহুবার সে পাকিস্তানের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মাধ্যমে পুরস্কৃত হয়েছে এবং পাক বিদেশ নীতি নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তার।

ভারতে সব অধিবাসী হিন্দু : ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত সম্প্রতি বলেছেন, ভারতে যারা থাকেন তাঁরা সকলেই হিন্দু। এমনকী মুসলমানদেরও জাতি-পরিচয় হিন্দু, ধর্ম তাদের ইসলাম। তিনি বলেন, 'যারা ভারতমাতাকে শ্রদ্ধা করেন তারা সকলেই হিন্দু। ধর্ম যাই হোক, কিংবা যে যে-ভাবে খুশি ঈশ্বরের আরাধনা করুক আমরা সবাই এক।' মধ্যপ্রদেশের বৈতুলে আয়োজিত একটি হিন্দু সম্মেলনে ভাষণ দেবার সময় তিনি বলেন, 'ভারতকে যদি সারা বিশ্বের গুরু হয়ে উঠতে হয় তাহলে হিন্দুদের দায়িত্ব নিতে হবে। ভুলভ্রান্তি কিছু হয়ে গেলে সবাই হিন্দুদের প্রশ্ন করবে। কারণ ভারতই হিন্দুদের একমাত্র দেশ।' হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ না হই, যদি অন্যদের সাহায্য না করি তাহলে কিছু অশুভ শক্তি গরিব, নিরক্ষর ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের শোষণ করবে। সামাজিক ভেদাভেদকে কাজে লাগিয়ে তারা কিছু মানুষকে দেশবিরোধী কাজ করার জন্য প্ররোচিত করবে। কেউ দুর্বল হয়ে পড়ুক আমরা চাই না। আমরা বরং চাই, শুধু হাত পেতে নেওয়া নয়, প্রতিদানে প্রত্যেকে দেশকে কিছু ফিরিয়ে দিতেও শিখুক।' হিন্দু সম্মেলনে যাওয়ার আগে তিনি বৈতুলের ১ নম্বর জেলব্যারাকে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধী নিহত হবার পর সঙ্ঘের ওপর রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞার সময়ে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক এম এস গোলওয়ালকরকে ১ নম্বর জেলব্যারাকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। শ্রী ভাগবত শ্রীগুরুজীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

উবাচ

"আমাদের বেশিরভাগ প্রাচীন সাহিত্যের ভিত হচ্ছে সংস্কৃত। তাই সংস্কৃত ভাষা যাতে বোধগম্য হয়, সে জন্য স্কুল পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তন করতে চাই আমরা।"

হিমন্ত বিশ্বশর্মা
অসমের অর্থমন্ত্রী

বাজেট ভাষণের প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে।

"অন্যের দেশভক্তির মাপার অধিকার কারোর নেই, আমারও নেই। কেউ নিজেকে নিজে দেশের হর্তা-কর্তা, যা কিছুই ভাবুক, তবুও তার অন্যের দেশভক্তি কতটা আছে তা মাপতে পারেন না। তা মেপে কোনো মন্তব্য করতে পারেন না।"

মোহন ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক,
আর এস এস

ভোপালে একটি পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে।

"ভারত কাউকে প্ররোচিত করে না। কিন্তু কেউ যদি ভারতকে প্ররোচিত করে, ভারত ক্ষমা করবে না।"

উত্তরপ্রদেশে সাহারানপুরে নির্বাচনী জনসভায়।

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

"ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা কমছে। কারণ, হিন্দুরা কাউকে ধর্মান্তরিত করে না। অন্যদিকে ভারতের সংখ্যালঘুরা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন। প্রতিবেশী দেশগুলির সংখ্যালঘুদের মতো অবস্থা নয় তাদের। অরুণাচল প্রদেশকে হিন্দুরাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা করছে বিজেপি— কংগ্রেসের এই অভিযোগ প্ররোচনামূলক।"

কিরেন রিজিজু
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র
প্রতিমন্ত্রী

অরুণাচলপ্রদেশ নিয়ে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অভিযোগ প্রসঙ্গে।

"বাংলার বুদ্ধিজীবীরা মেরুদণ্ডহীন। এরা লাল আমলে লাল, সবুজ আমলে সবুজ।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য
সভাপতি

অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

খারাপ মোদীর ভালো দিক

মাননীয় অমিত মিত্র
অর্থমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনি বুঝেছেন। এবার দিদিকে বোঝান। দিদি আপনার কথা শোনেন না জানি, কিন্তু চুপি চুপি বোঝান। দিদির কথায় কথা মিলিয়ে আপনিও নোট বাতিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনেক খুঁত ধরেছেন। দিদি তো মোদীকে গুণ্ডা, বদমাইশ কিচ্ছু বলতে ছাড়েননি। আপনিও অর্থনীতির জটিল তত্ত্ব হাজির করে বুঝিয়েছেন যে, এই নোট বাতিল দেশে সর্বনাশ ডেকে আনবে। কিন্তু বাস্তব বুঝে সাধারণ মানুষ আপনাদের কথায় কান দেননি। এখন রাজ্যের বাজেট পেশ করে আপনি বুঝিয়ে দিলেন শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আপনার সরকার, আপনার কোষাগারেও নোট বাতিলের সুফল মিলেছে।

বাজেট বক্তৃতাতেও আপনি নোট নাকচের সিদ্ধান্তকে আগাগোড়া তুলোধোনা করেছেন। সে তো দিদিকে খুশি করতে বলতেই হবে। কিন্তু আপনি যে হিসেব পেশ করেছেন তার পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, নোট বাতিলের জেরে ক্ষতি হওয়া তো দূর অস্ত, বরং কিছুটা লাভই হয়েছে বাংলার!

নোট বাতিলের পরের দু'মাসে ৫,৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর আশঙ্কা করেছে রাজ্য। অথচ আপনি যে বাজেট পেশ করলেন, তার পরিসংখ্যান বলছে, এই অর্থবর্ষে রাজ্যের নিজের কর আদায় পৌঁছে যাবে লক্ষ্যের কাছাকাছি। আদায় কম হবে মাত্র ১,৮৪৭ কোটি টাকা। যেখানে আগের বার এই ফারাক ছিল ৪,০০০ কোটি। চোখে পড়ার মতো বেড়েছে কেন্দ্রীয় করের ভাগও। ২০১৬-'১৭ সালে ওই খাতে ৪১,৮৬১ কোটি টাকা পাওয়ার কথা ছিল সেখানে মিলছে ৪৪,৬২৫ কোটি।

কর ও কর বহির্ভূত আয় মিলিয়ে, রাজ্যের মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৩০ কোটি টাকা। সেখানে সংশোধিত হিসাবে রাজ্যের দাবি, তা হবে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৪০ কোটি। অর্থাৎ, ফারাক প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থকর্তারা মানছেন যে, রাজস্ব আদায়ে এমন সাফল্য অতীতে আসেনি। একে নোট বাতিলের সুফলই তো বলতে হবে নাকি। আসলে নোট বাতিলের ফলে এখন 'কালো' কারবার 'সাদা' করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক ব্যবসায়ী। তার সুফল তো মিলবেই।

খারাপ মোদীর সেই ভালো দিক যে রাজ্যকে উপকার করবে তা বুঝেই আপনি বলেছেন, আগামী অর্থবর্ষে রাজ্যের নিজের কর আদায় এ বারের সংশোধিত হিসেবের তুলনায় প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা বাড়বে। আশা রেখেছেন, কেন্দ্রীয় করের ভাগ বাড়বে প্রায় ৫ হাজার কোটি। এবারের বাজেটেও মোট ১ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৭৮ হাজার কোটিই আসছে দিল্লি থেকে।

কর আদায় হওয়ার মূল কারণ আসলে নোট বাতিলই। পরিষেবা কর বৃদ্ধির জন্য রাজ্য গেল-গেল রব তুলেছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে, আখেরে সেই খাতেও বাড়তি ১,২০০ কোটি পেতে পারে বাংলা।

সব মিলিয়ে, রাজ্যের আখেরে লাভই হয়েছে মোদীর নোট বাতিলে। কিন্তু সেটা মুখে বলা যাবে না। মুখে বলার দরকারও নেই। বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখবেন অমিতবাবু রাজ্যকে আরও সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে নরেন্দ্র মোদীর। আগামী দিনে রাজ্যকে সঙ্গে নিয়ে নানা প্রকল্পের পরিকল্পনা জানিয়েছে কেন্দ্র। সে সব বয়কট করে শুধু শুধু রাজ্যের ক্ষতি করবেন না প্লিজ। দিদিকে বোঝান।

সুন্দর মৌলিক

নোট বাতিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ যে মিথ্যা রাজ্য বাজেটেই তা স্পষ্ট

গত সপ্তাহে বিধানসভায় রাজ্য বাজেট প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। অর্থনীতির মারপ্যাঁচে বা পরিসংখ্যানের কারচুপি ধরার বিদ্যে আমার নেই। অবশ্য এই আজব বাজেটের আলোচনায় তার প্রয়োজনও নেই। তৃণমূলদলের শৃঙ্খলাহীনতার মতোই মমতার দলীয় অবস্থানের সঙ্গে অমিত মিত্রর বাজেট প্রস্তাব পরস্পর বিরোধী। মমতার নীতি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর নোটবন্দির চরম বিরোধিতা করে রাজ্যবাসীকে বোঝানো যে পুরানো ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করেছেন মোদীজী। মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ নগদ টাকার অভাবে কাজ হারিয়েছেন...ইত্যাদি। মমতার গলাবাজির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেননি দিদির বাধ্য অর্থমন্ত্রী।

মমতা দাবি করেছেন নোট বাতিলের পরের দু'মাসে রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায়ে ক্ষতি হবে ৫৫০০ কোটি টাকা। অমিত মিত্র তাঁর বাজেট প্রস্তাবে বলেছেন নোট বাতিলের ফলে রাজস্ব আদায় কম হবে মাত্র ১৮৪৭ কোটি টাকা। গতবার অর্থাৎ নোট বাতিলের এক বছর আগে আদায়ের ক্ষেত্রে এই ফারাক ছিল ৪০০০ কোটি টাকার। অথচ দিদি চিল্লামিল্লি করছেন যে মোদীজীর নোট বাতিলের জন্য রাজ্যের আয় বিপুলভাবে কমছে। তা যে অসত্য সে কথা স্পষ্টভাবে অমিতবাবু তাঁর বাজেট প্রস্তাবে বলেছেন। আমার মনে হয় দিদি তাঁর দলীয় তহবিলের আদায়ে যে জোর ধাক্কা লেগেছে তার সঙ্গে রাজ্য সরকারের তহবিলকে গুলিয়ে ফেলেছেন। দিদি নিরন্তর অভিযোগ করছেন মোদী সরকার রাজ্যকে রাজনৈতিক কারণে বঞ্চনা করছে। অমিতবাবু বলছেন, কেন্দ্রীয় করের ভাগ ও অনুদান মিলিয়ে দিল্লির কাছে পাওয়ার কথা ৭৬ হাজার কোটি টাকা। বাস্তবে দিল্লির মোদী সরকার দিয়েছে ৭৮ হাজার কোটি টাকা। তাই বঞ্চনা দূরের কথা অতিরিক্ত ২ হাজার কোটি টাকা বেশি পেয়েছে রাজ্য। মমতা বলেছেন রাজ্যে কৃষি মার খেয়েছে নগদের অভাবে। ফলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা

গূঢ় পুরুষের কলম

আছে। অথচ দিদির অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় পেশ করা বাজেট প্রস্তাবে দাবি করেছেন যে এবার ৪২ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। আগের মতোই কমপক্ষে ১৮০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন হবে রাজ্যে। এক কথায়, নগদের অভাবে চাষ হয়নি এমন দাবি মিথ্যাচার ছাড়া অন্য কিছু নয়। দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়লে রাজ্যের কর আদায়ে তার প্রতিফলন পড়তো। কিন্তু তা হয়নি। কেন্দ্রীয় করের ভাগ বেড়েছে আয় করে। যার মূল কারণ হচ্ছে নোট বাতিল। ব্যবসায়ীরা কর দিয়ে সাদা টাকার পথে চলতে চাইছেন। কেন্দ্রীয় বাজেটে এবার পরিষেবা কর বৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবাদে দিদি চিৎকারে আসর মাতিয়ে দিয়েছেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে পরিষেবা খাতে এই রাজ্য পাবে ১,২০০ কোটি টাকা। দিদি রাজ্যের এই অতিরিক্ত আয়ের পথটি বন্ধ করতে চাইছিলেন। দিদির এমন আত্মঘাতী স্বভাবের জন্য বাংলা আজ ডুবতে বসেছে।

নোট বাতিল নিয়ে মমতার রাজনীতির বিরোধী তথ্যই রাজ্য বাজেটে ভুরিভুরি আছে। মমতা বলছেন, নোট বাতিলের ফলে সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চাষিদের কৃষি ঋণ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। চাষিরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ বাজেট পরিসংখ্যান বলছে সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চাষিদের কমপক্ষে ২,০০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে। নোট বাতিলের পর প্রায় সব ক্ষেত্রেই রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হয়েছে। শুধু আবাসন শিল্পের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটিতে আয় কমেছে। এর কারণ, আবাসন শিল্পে সবথেকে বেশি কালোটাকার বিনিয়োগ হয়। নোট বাতিলে কালোটাকার বিনিয়োগ মার খেয়েছে। নোট বাতিলে রাজ্যের আয় মোটেই মার খায়নি। মার খেয়েছে আবাসন এবং চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কালোটাকার কারবারিরা। মুখ্যমন্ত্রী কি এইসব অসাধু কারবারিদের রক্ষার জন্যই গেল গেল রব তুলছেন। নগদ টাকার অভাবে ভিন রাজ্য থেকে ফিরে আসা কাজ হারানো শ্রমিকদের মধ্য থেকে বাছাই করে ৫০ হাজার কারিগরকে মাথাপিছু এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে। তবে মমতার নীতি সম্পর্কে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা মনে করছেন যে এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই খাতে বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা। এই দান খয়রাতির রাজনীতিই সরকারি কোষাগারকে শূন্য করছে। একদিকে মমতা বলছেন যে নগদ টাকার অভাবে বাংলায় চাষিরা ভয়ানকভাবে মার খেয়েছেন। তাই মার খাওয়া চাষিদের আর্থিক অনুদান দিতে ১০০ কোটি টাকার তহবিল গড়া হচ্ছে। অন্যদিকে, অমিতবাবু তাঁর বাজেটে বলেছেন এবার ৪২ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে যা গত বছরের থেকে বেশি। এবার রেকর্ড খাদ্য উৎপাদন হবে পশ্চিমবঙ্গে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই দু'জনের মধ্যে কোনজন সত্য কথা বলছেন এবং কে রাজ্যবাসীর কাছে মিথ্যাচার করছেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর অর্থমন্ত্রী পরস্পর বিরোধী তথ্য দিয়ে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করছেন। অতীতে এমন নজির নেই। রাজনীতির সঙ্গে প্রশাসনকে গুলিয়ে ফেললে এমনটাই হয়। মোদী-বিরোধী রাজনীতি করতে গিয়েই উল্টোপাল্টা কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর অর্থমন্ত্রী। মমতার রাজনৈতিক বাজেটকে তাই গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

দুশো বছরের ঐতিহ্য এবং অবক্ষয়

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে জমকালো আসর বসেছিল কলেজ স্ট্রিটের শিক্ষাঙ্গনে। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড. মনমোহন সিং মূল ভাষণ দিলেন। কয়েকদিন আগে প্রিন্সেপ ঘাটে আসর বসেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নামকরা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা এসেছিলেন। সবারই মুখে এক কথা— কলেজের ঐতিহ্য কেমন যেন ফিকে হয়ে আসছে। সেই গৌরবময় উৎকর্ষের স্রোতে ভাটা নেমে এসেছে। আবার রাজনীতির অনুপ্রবেশ অশুভ প্রভাব ফেলেছে সে কথাও অনেকের মুখে শোনা গেল। নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রতিকূল প্রভাব দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দলীয় গণতন্ত্রের দাপাদাপি কি বৌদ্ধিক উৎকর্ষের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে?

মনে খটকা লাগে ১৯৫৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। তিনি বলেছিলেন তাঁর জীবন ও মননের বিকাশে কলেজের প্রধান ভূমিকা ছিল। ২০১৭ সালে কলেজের ১৬২ তম বার্ষিকী পালিত না হয়ে দ্বি শতবর্ষ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হলো। এর অর্থ হলো ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজকে কলেজের ভিত্তিবর্ষ ধরা হয়েছে। আবার ২০১০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ কলেজের পরিচিতি খুইয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঐতিহ্য ও গরিমা কি বিশ্ববিদ্যালয় আত্মসাৎ করতে চেয়েছে? ঐতিহ্য কখনও আরোপ করা যায় না, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় শতচেষ্টা করলেও অতীত গরিমা পুনরুদ্ধার করতে পারবে না।

আসলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস নিছক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস নয়। এই কলেজে উনিশ শতকের বাংলার বৌদ্ধিক সংগ্রামের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। কী ছিল সেই বৌদ্ধিক সংগ্রাম? উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস আত্মানুসন্ধান ও আত্মপরিচয়ের যুগ নামে পরিচিত। এই সময়ে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ছিল বাংলার নবজাগরণের মূল অনুঘটক। এই বৌদ্ধিক সংগ্রাম ছিল আধুনিকীকরণের সংগ্রাম। কিন্তু আধুনিকীকরণ নেহাত পাশ্চাত্যকরণ ছিল না, দেশীয় সমাজ ও ধর্ম ব্যবস্থায় গলদ ও গোঁড়ামি দূর করার জন্য সংস্কার আন্দোলনের স্রোতোধারা শুরু হয়। নেহাত মন্দ পাশ্চাত্যকরণ বা বিদেশি শাসনের পদলেহন নয়, ঐতিহ্যকে নস্যাৎ না করে ঐতিহ্যের আলোকে দেশ ও সমাজকে নবকলেবরে আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন বাংলার নবযুগের স্থপতিবৃন্দ। আর এই চেতনার সংগ্রামের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ছিল কলকাতার হিন্দু কলেজ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত না করে প্রেসিডেন্সি কলেজকে স্বশাসিত কলেজে পরিণত করলে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হোত। ...ভালো শিক্ষক ও ভালো ছাত্র এ দুটিই হলো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষের মাপকাঠি।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও কলকাতার নাগরিক সমাজ

হিন্দু কলেজ ছিল এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণতি। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য ইংরেজি শিক্ষার যে তাগিদ দেখা দেয়, তার ফলেই হিন্দু কলেজের যাত্রা শুরু হয়। এর জন্য কোনো সরকারি উদ্যোগ ছিল না। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাই ১৮১৩ সালে সনদ আইনে শিক্ষার প্রসারের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হলেও তা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে কিছু সহৃদয় ইংরেজ আর কলকাতার নাগরিক সমাজের শীর্ষস্থানীয় মান্যগণ্য ব্যক্তি যৌথ উদ্যোগে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি গোরাচাঁদ বসাকের ৩০৪ চিৎপুর রোডের এক অপরিসর ভাড়া বাড়িতে ২০ জন ছাত্রকে নিয়ে হিন্দু কলেজ আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য এর বছর খানেক আগেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন শুরু হয়। ডেভিড হেয়ারের প্রস্তাবে ১৪ মে

১৮১৬ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাইড ইস্ট-এর বাসভবনে গণ্যমান্য ইংরেজ ও এদেশীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কুড়ি জন ভারতীয় ও দশজন ইংরেজ সদস্য নিয়ে কলেজ কমিটি গঠিত হলো। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ধমানের মহারাজা, পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর ও বড়বাজারের মল্লিক পরিবার প্রচুর অর্থ দান করেন। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন জেমস আইজাক দি' আনশ্লেম। আর কামিটির সম্পাদক ছিলেন দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। পরে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি হয়ে টেরিটি বাজারের একটি ভাড়াবাড়িতে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। হিন্দু কলেজের নিজস্ব বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ তারিখে। এর জন্য সরকারি নির্দেশনামা বের হয় ৭ নভেম্বর ১৮২৩। ভাবতে অবাক লাগে রাজা রামমোহন রায়ের নাম হিন্দু কলেজ কমিটিতে ছিল না। আসলে রামমোহন ইচ্ছা করে কমিটির ভেতরে ঢোকেননি। কিন্তু তিনিই ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে রামমোহন হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও তাঁর ভাবনা চিন্তার সার্থক প্রতিফলন ছিল হিন্দু কলেজ। প্রসঙ্গত বলা যায় রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার সদস্য বৈদ্যনাথ মুখার্জি ও রামমোহনের অনুরাগী ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর (৪ জুলাই ১৮১৭) কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি নামে একটি বেসরকারি সমিতি স্থাপিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশ শুরু হলো। হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য গ্রন্থগুলি রচিত হোত।

হিন্দু কলেজের প্রথম দিকের ইতিহাসে যে ব্যক্তির নাম বিতর্কের ঝড় তুলেছিল তিনি হলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯- ১৮৩১)। ঝড়ের পাখি নামে পরিচিত হিন্দু কলেজের এই তরুণ শিক্ষক সম্পর্কে অভিযোগ হলো তিনি নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী নামে পরিচিত ছাত্রদের মনে যুক্তিবাদের প্রভাব ফেলেছিলেন। এর ফলে সেই অপরিণত যুবক গোষ্ঠী দেশীয় ধর্ম ও আচার আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিষ্য হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। কলকাতার রক্ষণশীল সমাজপতিদের রোষানলে পড়ে তিনি কলেজের শিক্ষকতা থেকে পদত্যাগ করলেন। ডিরোজিও-র সাক্ষাৎ শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র অবশ্য ডিরোজিওকে মুক্ত চিন্তার দিশারি বলে মন্তব্য করেছেন। সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার আলোচনায় তিনি স্বাধীন যুক্তিবাদী মতামত ব্যক্ত করতেন। ডিরোজিওকে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধ সমর্থক বলা যায় না। ভারতের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি 'স্বদেশ আমার' বলে বন্দনা করেছিলেন। 'দেবতা সমান পূজ্য' স্বদেশভুমির অতীত মহিমা কেন এখন হীনপ্রায় একথা ভেবে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীভুক্ত ডিরোজিও-র শিষ্যগণ প্রত্যেকেই ছিলেন যোগ্যতাসম্পন্ন। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তারুণ্যের উচ্ছ্বাস কাটিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে ওঠেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সরব হন। প্যারীচাঁদ মিত্র সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবায় লিপ্ত হন। রামতনু লাহিড়ী আদর্শ শিক্ষাব্রতী রূপে খ্যাতিলাভ করেন। নব্যবঙ্গের তরুণদের সহায়তায় রাজনৈতিক মত প্রকাশের জন্য বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (এপ্রিল ১৮৪৩) স্থাপিত হলো। আর একজন নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর প্রবক্তা রসিককৃষ্ণ মল্লিক সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন (১৮০১-১৮৬৫) ছাত্রদের মধ্যে প্রবল প্রভাব ফেলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গ্রন্থে লিখেছেন 'ডিরোজিও ও রিচার্ডসন উভয়েই ছিলেন সত্যকার শিক্ষাব্রতী'। ১৮৩৫ সালে রিচার্ডসন কলেজের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৮৩৯ সালে কলেজের অধ্যক্ষ পদে প্রবিষ্ট হন। রিচার্ডসনের ছাত্রদের মধ্যে মধুসূদন দত্ত, রাজানারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার, গৌরদাস বসাক ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলেজে অধ্যাপক করেন। পরে ১৮৪৮ সালে পুনরায় কলেজে ফিরে আসেন। কিন্তু সরকারি কর্তাদের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় পদত্যাগ করেন।

হিন্দু কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। এক্ষেত্রে রাধাকান্ত দেবের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ ৩৪ বছর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য থাকার পর ১৮৫০ সালে পদত্যাগ করেন। রাজনারায়ণ বসু রচিত 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৮৫৩ সাল নাগাদ রসময় দত্ত ভিন্ন অন্য ভারতীর সদস্যবৃন্দ হিন্দু কলেজ পরিচালকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের উন্মেষ

এবার হিন্দু কলেজের উপর সরকারি আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হলো। ১৮৫০ সালের পর কট্টর সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসির শাসনকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার চরমে ওঠে। অন্যদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটল। চার্লস উডের নির্দেশনামায় কেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো (১৮৫৪)। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে উচ্চশিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত কাঠামোর মধ্যে আনা হলো, অন্যদিকে শিক্ষা সংসদের হাত থেকে সরিয়ে শিক্ষা অধিকর্তার পদ সৃষ্টি হলো। ১৮৫৫ সালের ২২ মার্চ শিক্ষা সংসদ এক নির্দেশে হিন্দু কলেজের সিনিয়র সেকশনকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত করল আর জুনিয়র সেকশন হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত হলো। সমস্ত ধর্ম ও বর্ণের ছাত্রদের প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষাদানের নীতি ঘোষিত হলো।

প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনের কেন্দ্রস্থল। কলেজে তখন প্রযুক্তিবিদ্যার পঠন পাঠন হোত। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। সম্প্রতি কলেজের দ্বিশতবর্ষ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হলো। সংবাদপত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতীছাত্রদের কথা ফলাও করে বলা হলো। কিন্তু তিনজন প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী কোনোরকম স্থান পেলেন না। এরা হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষার উৎকর্ষ ও স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে

মহানায়ক ছিলেন স্যার আশুতোষ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঐতিহ্যকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে প্রসারিত করেছিলেন। সরকারি অনুদানের অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার কখনও লঙ্ঘন করতে দেননি। কারণ স্বাধিকার ব্যতীত শিক্ষার উৎকর্ষ সম্ভব নয়। তিনি সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। বলেছিলেন— "Freedom first, freedom second, freedom always–nothing else will satisfy me." বাংলার গভর্নর লিটনকে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে ছিলেন (মার্চ ১৯২৪)। ইতিপূর্বেই ১৯২৩ সালে প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণে স্যার আশুতোষ বলেছিলেন— একটি স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হলো সর্বশক্তি দিয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রতিহত করা। একটি বিশ্ববিদ্যালয় কোনোমতেই রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হবে না। তাঁর ভাষায় "We stand unreservedly by the doctrine that if education is to be our policy as a nation, it must not be our politics, freedom is its very life blood, the condition of its growth, the secret of its sucess." দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আশুতোষ বলেছিলেন— কাউন্সিল (এখনকার বিধানসভা) আসবে যাবে। মন্ত্রীরা শোভাবর্ধন করবেন আবার তলিয়ে যাবেন, দলগুলি উঠবে আবার তলানিতে যাবে, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্বমহিমায় বিরাজ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, স্বনির্ভর হলেও দেশ ও জাতির বিকাশে তার প্রাণমন নিবেদিত।

শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনের মহীরুহ ছিলেন স্যার আশুতোষ। আর রাজনীতির আঙিনায় স্বাদেশিকতা ও স্বাধিকারের সফল রূপকার ছিলেন প্রেসিডেন্সির আর এক খ্যাতনামা প্রাক্তনী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। বাংলার কংগ্রেস রাজনীতিকে প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল ও সংগ্রামের দ্বৈত রণকৌশলের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালের কংগ্রেস রাজনীতির দিক নির্দেশ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী নেতাজী সুভাষ ছিলেন তাঁর সার্থক উত্তরসাধক। আর ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ একদিকে যেমন তাঁর পিতার ঐতিহ্য সফলভাবে অনুসরণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বহাল রেখেছিলেন, অন্যদিকে বাংলার রাজনীতিতে এক সংকটজনক পর্বে বাংলার ত্রাতা হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রামে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বাংলার দুর্ভাগ্য, তাঁর জন্মশতবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কর্মসূচি নেয়নি। 'এক বিধান, এক নিশান'-এর স্বার্থে তাঁর সংগ্রাম অবিস্মরণীয়।

উৎকর্ষের অপমৃত্যু

২০১০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উত্তীর্ণ হয়। অন্যান্য রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে একই আসনে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় পংক্তিভুক্ত হলো। চার-পাঁচ বছরে তিনজন উপাচার্য এলেন গেলেন। প্রেসিডেন্সির সুমহান ঐতিহ্য চর্বিত চর্বন করলে ঐতিহ্য বজায় থাকে না। খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে গেলেন। একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আর সর্বশক্তিমান সরকারের অঙ্গুলি হেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা ওঠা বসা করেন।

প্রেসিডেন্সির অবনমন হঠাৎ হয়নি। বিগত বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের শাসনকালে প্রেসিডেন্সির উৎকর্ষ সংহারে ধারাবাহিক চেষ্টা চালিয়েছে। সংকীর্ণ দলতন্ত্র ছিল এই সংহারের মূল কারণ। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে অধ্যাপকগণ প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা করা শ্রেয় বলে মনে করতেন। আমরাও ছাত্রজীবনে দেখেছি ইংরেজিতে তারকনাথ সেন, ইতিহাসে সুশোভন সরকার ও অমলেশ ত্রিপাঠী, অর্থনীতিতে ভবতোষ দত্ত, পদার্থ বিদ্যায় অমল রায়চৌধুরী, রসায়নে প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত প্রমুখ প্রবাদপ্রতীম শিক্ষাবিদ অধ্যাপনা করছেন। পরাধীন ভারতে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কুরুভিলা জ্যাকোরিয়া, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, কুদরু-ই-খুদা প্রমুখ অধ্যাপনা করতেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সমিতির রাজনীতির দাপটে শিক্ষার মান হ্রাস পেতে লাগল। প্রেসিডেন্সি কলেজকে আর পাঁচটা সরকারি কলেজের সঙ্গে সমান করার নীতি গৃহীত হলো। উচ্চমানের শিক্ষক প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে লাগলেন। আর প্রেসিডেন্সিতে ভালো অধ্যাপকদের বদলি না করে সমিতির অনুগত অধ্যাপকদের আনা হলো। শিক্ষকরা বুঝলেন সরকারি দলের আজ্ঞাবহ হলে ক্লাস না নিলেও তাঁরা প্রেসিডেন্সিতে বহাল থাকবেন।

প্রশ্ন হলো ব্রিটিশ আমলেও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ছিল, কিন্তু তাঁরা উৎকর্ষের বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের আত্মচরিত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ কোনোমতেই পুলিশকে কলেজে প্রবেশ করতে দেননি। আশুতোষ বিদেশি শাসকগোষ্ঠী অথবা গণতন্ত্রের নেতিবাচক প্রভাব উভয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। এখন গণতান্ত্রিক শাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাত্রা দানবীয় চরিত্র ধারণ করেছে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির অশুভ বিষাক্ত অনুপ্রবেশ বন্ধ না করতে পারলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়।

আসলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত না করে প্রেসিডেন্সি কলেজকে স্বশাসিত কলেজে পরিণত করলে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হোত। আরও প্রয়োজন, সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির খবরদারি বন্ধ করা। এখন অন্য নামে আর এক শিক্ষক সমিতি বেয়াদপি করতে উন্মুখ। আর প্রয়োজন মেন্টর গ্রুপের বিলুপ্তিকরণ। প্রেসিডেন্সির গৌরব গরিমা তো মেন্টরদের উপর নির্ভর করে না। এ এক সহজাত প্রক্রিয়া, ভালো শিক্ষক ও ভালো ছাত্র এ দুটিই হলো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষের মাপকাঠি।

স্যার আশুতোষ ছিলেন বাংলার বৌদ্ধিক সংগ্রামের মহানায়ক। তিনি বলেছিলেন— স্বাধীনতাই প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষকথা। আর এখন পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রের ভেকধারী স্বঘোষিত নেতাদের কাছে 'রাজনীতিই প্রথম, রাজনীতিই দ্বিতীয় আর রাজনীতিই শেষ কথা।' তোলা, চিটফান্ড সংরক্ষণ ও ভরতুকির মহাযজ্ঞে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বলি দিতেই হবে।

(লেখক প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী ও ইতিহাসবিদ)

ট্রাম্পের নয়া অভিবাসন নীতি

মুখোমুখি দুই বিশ্ব

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

সমস্যাটি গভীর। গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনিক নির্দেশটিতে সই করেছেন। সাতটি মুসলমান প্রধান দেশের নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে চার মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। একদিনে সারা পৃথিবীতে এনিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রচার-মাধ্যমগুলো একটা ব্যাপার ইচ্ছাকৃত ভাবেই যেন ঘুলিয়ে দিতে চাইছে যে এই নির্দেশটি আপাতত সাময়িক। তাছাড়া এটি অন্য দেশের অভিবাসী, গ্রীনকার্ডধারী, ছাত্রছাত্রী গবেষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই নির্দেশটি ইসলামের বিরুদ্ধে বলে প্রচার হলেও--- পৃথিবীর পঞ্চাশটির মতো মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র সাতটি (ইরান-ইরাক-সিরিয়া-সোমালিয়া-ইয়েমেন -লিবিয়া) দেশের নাগরিক এই নির্দেশে অসুবিধায় পড়বেন। অর্থাৎ বিষয়টি অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত অতিরঞ্জন বলে মনে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে লক্ষের কাছাকাছি মানুষ নাকি অসুবিধায় পড়েছেন। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন, এই নির্দেশের ফলে হনলুলু ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পর্যটন-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। ওই সাতটি দেশের নাগরিকরা বেছে বেছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেই হাওয়া-বদল করতে যায় কিনা জানা যায় না। ষাট হাজার ভিসার আবেদন স্থগিত হয়েছে। সবাই এই উদ্দেশ্যে মার্কিন দেশে যাবার পরিকল্পনা করেছেন বলে মনে হয় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। তাদের সংবিধান মেনেই ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। এর আগে ওবামা-জমানায় মুসলমান-তোষণের বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। ৯/১১-র বিধ্বংসী হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালাবার পর 'গ্রাউন্ড-জিরো'-তে মসজিদ তৈরির অনুমোদন দিয়েছেন বারাক হুসেন ওবামা। ওই ঘটনার মূল চক্রী সৌদি আরবের নাগরিক হওয়ায় কেন সে দেশ ক্ষতিপূরণ দেবে না— এই প্রশ্নে উত্তাল হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই অভিযোগ আদালত অবধি গড়ায়। সর্বোচ্চ আদালত এই অভিযোগের সারবত্তা মেনে সৌদি আরবকে আইনি সমন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বারাক ওবামা এই সক্রিয়তা বন্ধ করেন তাঁর বিশেষ ক্ষমতা (ভেটো) প্রয়োগ করে। এ সময় আজকের মানবতাবাদী বিশ্ব-নাগরিকরা কী বলেছেন, কিছু বলেছেন কিনা— জানা যায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু মানুষ এইরকম অভিজ্ঞতায় এক ধরনের আশঙ্কায় তাড়িত হয়ে থাকবেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিগত নির্বাচনে বিজয়ী হবার পিছনে সংখ্যাগুরু মার্কিন নাগরিকদের মনের আশঙ্কা কাজ করেছে— সেটা অমূলকও ছিল না। মার্কিন মুলুকে অবাধ অভিবাসন নীতি, উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নিরপেক্ষ শক্তিশালী বিচারব্যবস্থার সুযোগ নিচ্ছে বেশ কিছু দেশের মুসলমান কুচক্রীরা।

আমাদের দেশে সংসদে হামলা, মুম্বই শহরে ২৬/১১-র আক্রমণে যুক্ত কয়েকজন কুচক্রীর মার্কিন-দেশে লুকিয়ে থাকার খবর পাওয়া গেছে। সুতরাং আমাদের এই ঘটনায় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেবারই কথা। তবে মানবতার সঙ্গে যারা সন্ত্রাসবাদ ও

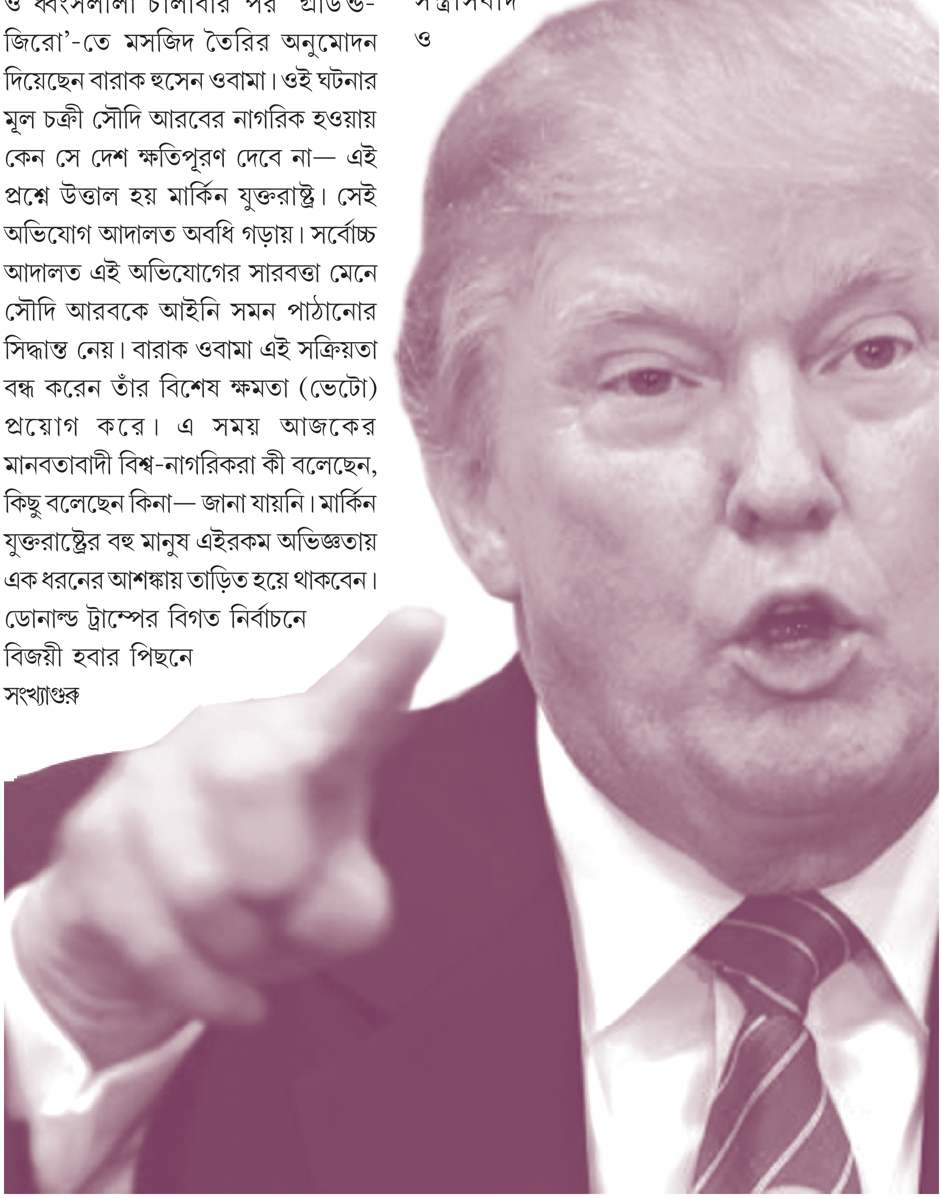

দেশবিরোধী শয়তানিকে মিশিয়ে শিককাবাব সাজিয়ে চা পান করতে অভ্যস্ত তাঁরা এতে ফ্যাসিবাদের উত্থান লক্ষ্য করে দেশব্যাপী প্রচারে লেগে পড়েছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ বামপন্থায় বিশ্বাসী। যদি প্রশ্ন করি, স্ট্যালিনের আমলে রাশিয়ার সাইবেরিয়ার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কি মানবতার চর্চা হোত? সেগুলো কি হিটলারের গ্যাস-চেম্বার বা 'আউসভিৎস'-এর চেয়ে কম কিছু ছিল? মাও-সে-তুং-এর লংমার্চ— সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যাদের কোতল করা হয়েছে তাকে কোন যুক্তিতে সমর্থন করা যায়? পলপটের আমলে কাম্বোডিয়ায় কত লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে— সে সময় এই বাম বুদ্ধিজীবীরা কোথায় ছিলেন? প্রায়ই দেখি, এঁরা বক্তৃতা দিতে, চিকিৎসা করাতে মার্কিন দেশেই যান। কেন? ওটা তো ধনতন্ত্রের পীঠস্থান!

মার্কিন দেশে বিচারব্যবস্থা যথেষ্ট স্বাধীন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ ও আপত্তি উঠেছে নানা নিম্ন আদালতে। যেমন--- ওয়াশিংটনের সিয়াটেলের জেলা আদালতের বিচারপতি জেমস রবার্ট, ভার্জিনিয়ার বিচারপতি লিওনি ব্রিস্কেমা, ম্যাসাচুয়েটস- এর বোস্টন আদালতের বিচারপতি ন্যাথানিয়েল গারটন আর নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন আদালতের বিচারপতি ক্যারন আমোন রায় দিয়েছেন সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হোক এই নির্দেশনামা। আমরা এ নিয়ে বেশি মন্তব্য না করে অপেক্ষা করার পক্ষপাতী। তবে কিছু কিছু রায় সত্যি কৌতূহলের উদ্রেক করে। মিসিগানের ডেট্রয়েটের বিচারপতি ভিক্টোরিয়া রবার্টস বলেছেন--- এই নির্দেশ গ্রীন- কার্ডধারীদের জন্য প্রযোজ্য না হওয়াই ভালো। ক্যালিফোর্নিয়ার আদালত ইরানের পাসপোর্টধারী আলি খোশাবখতি ভায়েঘানের আবেদন মেনে তার পক্ষে রায় দিয়েছে। খোশাবখতিকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দুবাই হয়ে ইরানে ফেরত পাঠানো হয়েছিল; তাকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ কার্যকর হয়েছে। মার্কিন নীতির বিপক্ষতা করে ইরান সরকার যে সে দেশের কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাওয়া মার্কিন দলটিকে ঢুকতে দেয়নি, সেটা কতদূর সভ্য দেশের ব্যবহার? এ ব্যাপারে মানবতাবাদীদের জিজ্ঞাসা করার কোনো রুচি নেই। মোটকথা, অসভ্য ক্রূর বর্বর পরধর্ম বিদ্বেষীরা এখন সভ্যতার মুখোশ পরে উচ্চকণ্ঠে কথা বলছে! হাস্যকর এই চেষ্টা। বিশ্ববাসী অচিরেই তা বুঝবে আশা করি। বিশেষত ভারত— যা ভেঙে দুটো দেশ বানিয়েও শান্ত না থেকে যে-ইসলামি আক্রমণকারীরা এদেশে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছে— এ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর আমাদের আশঙ্কা প্রতিক্রিয়া একরকম হবারই কথা।

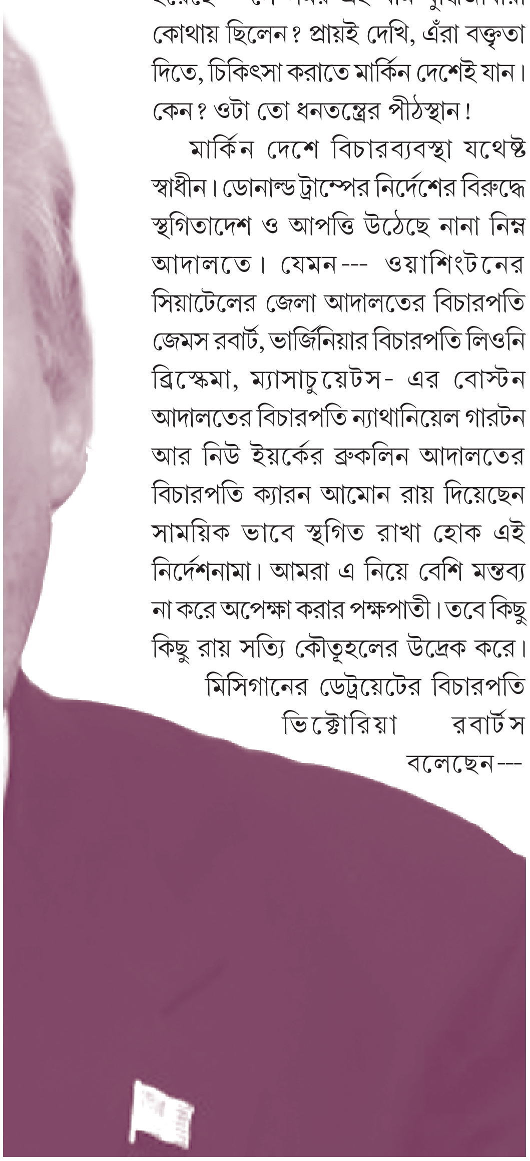

২

মার্কিনদেশে আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা গবেষণা করার জন্য যাত্রা করেন। সেটা মন্দ কিছু নয়। গত বছর স্টিভ ব্যানোন পরিচালিত একটি বেতার অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ডোনাল্ড বলেছিলেন : হার্ভার্ড, ইয়েল, প্রিসটন, পেন্, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব প্রতিভাদীপ্ত (ট্রাম্পের ভাষায় 'not only graduate but do great') ছাত্রছাত্রী গবেষক আছেন তাদের অনেকেই দক্ষিণ- এশিয়ার; বিশেষত ভারতের। এরা প্রতিভায় দক্ষতায় যোগ্যতায় মার্কিন দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি চান, এরা সেদেশে থাকুন, আসুন, কারণ এটা প্রয়োজন— 'we have to keep our talented people in this country.'

সমস্যা হলো, এইসব উজ্জ্বল তরুণতরুণী মার্কিন দেশেই চাকরি করতে আসেন। ডোনাল্ড লক্ষ্য করেছেন এদের অধিকাংশ সেদেশেই থেকে যাচ্ছেন! এটা মার্কিন দেশের চাকরিপ্রার্থীদের পক্ষে ভয়ঙ্কর। কিছু কোম্পানি আছে, বিশেষত ভারতের তরুণদের কম পারিশ্রমিকে নিয়োগ করছে। ফলে মার্কিন দেশের চাকরির বাজারের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আমার মনে হয়, এই সমস্যা সব উন্নত দেশেই অল্পবিস্তর আছে। সেটা সমাধান করবেন সেসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা, কূটনৈতিক-স্তরে সে ব্যাপারে আলাপ আলোচনা চলবে। বিষয়টি একতরফা কোনো দেশেরই পত্রপাঠ অস্বীকার করা বা টুইট করে লোক খেপানোর চেষ্টা করা অত্যন্ত আপত্তিকর। আমাদের রাজ্যের সবজান্তা মুখ্যমন্ত্রী সেটাই করে চলেছেন।

মার্কিনদেশে অভিবাসন নীতির 'এইচ ১ বি'-ধারাটি বদলের প্রস্তাব করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প। এতে বলা হচ্ছে, ছাত্রছাত্রী-গবেষকরা পাঠান্তে সেদেশে থাকতে, চাকরি করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, এর ফলে ভিসা-বাবদ বরাদ্দ ডলারের পরিমাণ বাড়ানোর পরিকল্পনাও আছে। অন্যান্য বিধিনিষেধেরও যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হয়েছে।

কিছুদিন থেকেই এই কথা জানা যাচ্ছিল। এনিয়ে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মার্কিন দেশে যাওয়ার প্রবণতা কমেছে। একটা তথ্য-সারণি তৈরি করা হলো এই প্রবণতাটি বোঝানোর জন্য :

দেখা যাচ্ছে, ব্রিটেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

সারণি

	২০১১-১২	২০১৫-১৬	মন্তব্য
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,৭০,০০০	৪২,৫০০ (আনুমানিক)	২৫% (–)
ব্রিটেন	২৪,০০০	১৪,৪০০	৪৪% (–)
কানাডা	২৭,৩০০	৪৮,৫৮৮	৭০% (+)

আমাদের পড়ুয়ারা এখন কম যাচ্ছেন। কানাডা তাদের পছন্দের তালিকায় এগিয়ে আসছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু পরামর্শদাতা এরকম অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। ইউ এস স্কুল অ্যাট এতটইস-এর শিক্ষা-পরামর্শদাতা অনুপম বিজয় ওপিটি (optional practical training)-র দিকে বিশেষ নজর রাখতে বলেছেন। এডুঅ্যাওআরড কনসালটিংস-এর প্রতিভা জৈনের মতে ভারতীয় পড়ুয়ারা অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে গেলে ভালো করবেন। হোয়াইট গ্লো কনসালটেন্সির রাজীব গাঙ্গুর পরামর্শ কানাডা বা এশিয়া-পেসিফিক-দেশগুলিকে পছন্দ করাই ভালো। তবু, ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ১৫.৯ শতাংশ আমাদের দেশ থেকে মার্কিন মুলুকে যাচ্ছেন।

মার্কিন দেশের অভিবাসন আইনটির ১০১ (এ) (১৫) (এইচ)-এর ১-বি অনুচ্ছেদ বদলের ফলে ভারতীয় পড়ুয়ারা নিশ্চয় বিড়ম্বনায় পড়বেন। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতীয় পরামর্শদাতা সালাভ কুমার জানাচ্ছেন, বিচিত্র রকমের জালিয়াতি আটকানোর জন্যই এই আইন পাল্টানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে (is aimed at curbing fraud')। এর ফলে ভারতীয় পেশাজীবীদের কোনো ক্ষতি হবে না— এই উদ্যোগ, 'not a blanket punitive measure against Indian professional'. ট্রাম্পের ভারত সংক্রান্ত পরামর্শদাতা, Indian American Advisory Council-এর সদস্য কুমার-এর প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তব হবে ভবিষ্যৎ তা বলবে। এখনই আগ বাড়িয়ে এ ব্যাপারে কিছু লিখছি না। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এসব নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে; জানিয়েছেন বিদেশ সচিব বিকাশ স্বরূপ।

মার্কিন মুলুকের বিভিন্ন কোম্পানিতে ভারতীয়রা উচ্চপদে আসীন। বিশেষত কম্পিউটার নির্ভর সংযোগ ব্যবস্থায় আমাদের দেশবাসী তরুণরা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে কাজ করেন। বলা হচ্ছে সিলিকন ভ্যালিতে সিইওদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ, কোথাও কোথাও তিন-চতুর্থাংশ হলেন ভারতীয়। এদের উপর নতুন ব্যবস্থার কী ফল ফলবে তা বলার সময় এখনও আসেনি।

গুগলের প্রধান কার্যালয় মাউন্টেন ভিউ-এর প্রধান খড়্গপুর আইআইটির প্রাক্তন ছাত্র ভারত-গৌরব সুন্দর পিচাই একাই নেই, আছেন ২০০০-এর মতো ভারতীয় কর্মী। ফলে এক ধরনের ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে। সেসব অমূলক বলছি না, তবে অতিরঞ্জিত বলেই মনে হচ্ছে।

৩

সানফ্রানসিসকো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আটকে পড়া বিমানে আসা যাত্রীরা বিক্ষোভ করেছে। 'উবের'-এর মুখপাত্রী চেলিসিয়া কোহল এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যবসায়িক পরামর্শদাতা অভিবাসী কালানিখ পদত্যাগ করেছেন; তাঁর বক্তব্য অভিবাসী-সংক্রান্ত নির্দেশটি তাঁর মতো অভিবাসীদের পক্ষে বিপজ্জনক--- 'its issues for our community.' আমার ব্যক্তিগত বন্ধু বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফ্রাঙ্ক জে কোরম অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তিনি যুগোশ্লাভাকিয়া থেকে আসা বাবা-মায়ের কথা লিখেছেন। নোয়াম চমস্কি-র মতো বহু মানুষ দাবি করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি আসলে বহিরাগতদেরই সৃষ্টি। এসব কথা বলে তাঁরা ওদেশের আদিম অধিবাসী--- 'ইন্ডিয়ান (অর্থাৎ অটোমি-হাইদা প্রভৃতি) জনগোষ্ঠীর প্রতি অপমানের আঘাত করেছেন কিনা সে বিচার নাইবা করলাম। কিন্তু ইসলামি সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বংশপরম্পরায় মার্কিন দেশে অভিবাসী মানুষরা কেন যে এমন ভাবে নিজেদের মিশিয়ে ফেলছেন বুঝতে পারছি না।

সন্ত্রাসবাদের বীজতলা ওই সাতটি মুসলমান প্রধান দেশ কোনো অর্থেই মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে কিছুমাত্র সাহায্য করেনি। বরং তথ্য বলছে, আরও কিছু মুসলমান প্রধান দেশ (আফগানিস্তান ও পাকিস্তান)-ও এই নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আসতে চলেছে। পাকিস্তান কেন? এর উত্তরে বলব, কেন নয়? বিশিষ্ট দূরদর্শন-সঞ্চালক নাইসিকা চন্দন বলছেন— পাকিস্তান ট্রাম্পের পরবর্তী লক্ষ্য (CNBC. com)। হোয়াইট হাউসও মনে করছে, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়। ভুল নয় এই কথা। ৯/১১-র কুখ্যাত নায়ক ওসামা-বিন- লাদেন পাকিস্তানেই আশ্রয় পেয়েছিল।

২০১৫-তে সান বার নাডিনো হামলায় বেশ কয়েকজন মার্কিন নাগরিক মারা গেছে। এই ঘটনার পিছনে পাকিস্তানের এক দম্পতির ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মিলেছে। এবছর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাকিস্তান সরকার ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ঠিকমতো খরচ করছে কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন উঠছে। হাক্কানি-নেটওয়ার্ক দমন তো হচ্ছেই না উপরন্তু হাফিজ সইদের মতো কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী, নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়া, ইউরেশিয়ার প্রধান, ২০০৮-এর ২৬/১১-র মুম্বই বিস্ফোরণের কুখ্যাত চক্রী সেদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মার্কিন মনোভাব বুঝে পাকিস্তান হাফিজ সাইদকে গৃহবন্দি করেছে! তার আগে জামাত-উদ-দাওয়ার নাম বদলের সুযোগ দিয়েছে। সব তথ্যই ট্রাম্প প্রশাসন জানে। আর এজন্যই আমাদের দেশের জনসমর্থনহীন বামপন্থীরা, সবজান্তা মুখ্যমন্ত্রী পথে নেমে পড়েছেন! তাঁর স্নেহধন্যা ছাত্র-সংগঠনের নেত্রী এইচ-১-বি বলতে এইচ-আই-ভি বলে তাদের আন্তর্জাতিক জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন বটে।

২৮.১.২০১৭ তারিখে ইয়েমেনে মার্কিন ঘাঁটিতে আক্রমণ করা হয়েছে। মারা গেছে বেশ কজন মার্কিন সৈনিক। বোঝা যাচ্ছে, এই আক্রমণ ঘটিয়েছে আল-কায়দার সন্ত্রাসবাদীরা। এসমস্ত ব্যাপারে নজর না ফেলে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মানবতার শত্রু বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আসলে দেশে বিদেশে ইসলামি ফিদায়েঁ আর তাদের গিরগিটি মার্কা তামাম সহযোগীরা আজ একটি শেষ যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য তৈরি হয়েছে।

ইচ্ছা থাক না থাক এই সংগ্রামে আমাদের একটি পক্ষে দাঁড়াতেই হবে। ■

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ট্রাম্প-কার্ড
ভারত-আমেরিকা-ইজরায়েল

প্রণয় রায়

কূটনীতির দুনিয়া দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক দেশ নিজের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে নানা শক্তিজোট ভাঙে গড়ে। বিংশশতাব্দীর মানুষের মৃত্যু। কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করার আন্দোলন থেকে বাংলা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভয়ের পরিবেশ— সবই তো ইসলামি মৌলবাদের ফসল। তাই শুরু হলো মৌলবাদী ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন লড়াই। কিন্তু এখানেও পশ্চিমি শক্তি ভুল করল। তারা মনে করল আফগানিস্তানকে তালিবানমুক্ত ও ইরাককে সাদ্দামমুক্ত করলেই বোধহয় ইসলামি সন্ত্রাসবাদ শেষ হবে। ফলে তারা ভারতের উপর চলা ক্রমাগত পাকিস্তান-পোষিত ইসলামি সন্ত্রাসকে দেখেও দেখল না। ৯/১১-র ঘটনার পর পশ্চিমের কূটনীতিকরা নিজের ভুল কিছুটা হলেও বুঝতে পারলেন। আই এস আই এস নামক ইসলামি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অক্টোপাসের মতো মুসলমান সমাজকে আঁকড়ে ধরেছে। এই সেদিন বাংলাদেশে

ট্রাম্প, মোদী ও নেতানেয়াহু

শেষ কয়েক দশক বিশ্বের দুই শক্তিজোটের দাপট তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ককে সবসময় জাগিয়ে রাখত কিন্তু আটের দশকের শেষদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিঘটনের সঙ্গে সঙ্গে সে ভয় কিছুটা হলেও কমে আসে। ইতিমধ্যে নতুন নতুন মহাশক্তির উদয় বিশ্বরাজনীতিতে একটি স্থির অবস্থা নিয়ে আসে। কিন্তু বিশ্ববাসীর এ শান্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। একবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতেই আমেরিকায় ঘটল ৯/১১। বিশ্ববাসী চমকে দেখল ইসলামি সন্ত্রাসের যে আগুনে ভারতীয়রা হাজার বছর ধরে জ্বলছে তার তাপ কতটা। হাজার বছর বললাম কারণ আলাউদ্দিন খিলজি থেকে ঔরঙ্গজেবের অত্যাচার। টিপুর তলোয়ারের জোরে ধর্মান্তর থেকে মোপলার হিন্দু হত্যা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লগ্ন থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এক কোটির বেশি

> **চীন-পাকিস্তানের মতো দেশ ট্রাম্প-মোদী-নেতানেয়াহু জোটের সামনে দিশাহারা হবে।**

বেছে বেছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু মহিলাদের যৌনদাসী বানিয়েছিল জেহাদিরা। একই ঘটনা যখন সিরিয়ার সংখ্যালঘু খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ঘটছে তখন পশ্চিমি দেশগুলির টনক নড়েছে। অ্যাসোসিয়েশন ইউনিভারসাল অ্যালায়েন্স-এর নেতা কারলোস্ কোকটিপাহ গানজাহ'র কথায়, 'আমরা খ্রিস্টানরা মধ্য এশিয়ায় গণহত্যার শিকার হয়েছি আই এস আই এস জেহাদিদের হাতে।' কূটনীতিতে একটি কথা আছে— 'আমার শত্রু, তোমার শত্রু এক; চলো এক যোগে লড়াই করি'। মাটি অনেকদিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল এবার বোধ হয় অপেক্ষার দিন শেষ হলো। বিশ্ব কূটনীতির সমস্ত ছক ভেঙে নতুন এক শক্তিজোট গড়ে উঠছে ভারত-আমেরিকা-ইজরায়েল। অনেকে এই জোটে রাশিয়াকেও রাখতে চায়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে তরফ থেকে কোনো জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া

যায়নি। কিন্তু রাশিয়া যেহেতু ইসলামি জেহাদিদের দীর্ঘদিনের আক্রমণবিন্দু, সেহেতু রাশিয়ার এই জোটে শামিল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। অপর দিকে পাকিস্তানের বন্ধু চীন পুরোপুরি কোণঠাসা। নিজে ইসলামি সন্ত্রাসে আক্রান্ত হয়েও যেভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘে জেহাদিদের রক্ষা করে চলেছে তাতে চীন তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।

এবার নতুন শক্তিজোটের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিটা একটু বোঝা যাক। প্রথমে ভারত দিয়ে শুরু করি। দীর্ঘদিন ইজরায়েল ও আমেরিকা থেকে দূরে থাকার পর অটলবিহারী-জমানায় কূটনীতির এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। মনমোহন সিংহ সরকার ভোটব্যাঙ্কের কথা চিন্তা করে ইজরায়েলের সঙ্গে সখ্য না বাড়িয়ে আমেরিকার সঙ্গে মিত্রতা বাড়াতে থাকে। ২০১৪ সালে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতায় আসে এবং চরম জনপ্রিয় হিসেবে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীপদে শপথ নেন। দীর্ঘদিন পর ভারতবর্ষ একজন কঠোর প্রশাসক পায় বলে বিশ্লেষকদের মত। নরেন্দ্র মোদী সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পান না। তার পরিচয় সার্জিক্যাল স্টাইক থেকে নোটবন্দি। সেই সঙ্গে ইসলামি জেহাদিদের বিরুদ্ধে বিশ্বে জনমত গঠন।

এবার আসা যাক ইজরায়েলের কথায়। দীর্ঘদিন ইসলামি সন্ত্রাসের আঘাতে ছিন্নভিন্ন এই দেশ শুরু থেকেই তার কঠোর অবস্থানের জন্য প্রসিদ্ধ। সে প্লেন হাইজ্যাক সমস্যায় হোক বা সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণে। সেখানে এখন বর্ষীয়ান নেতা বেঞ্জামিন নেতানেয়াহু প্রধানমন্ত্রী। যাঁরা বিশ্ব রাজনীতির সামান্য খোঁজ রাখেন তাঁরাও জানেন, এই বয়োবৃদ্ধ নেতাটি কতটা দৃঢ়প্রত্যয়ী। ইজরায়েল দেশ গঠনের সময় থেকে ভারতের সঙ্গে সখ্য করতে চাইত কিন্তু ভারতের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিকরা তা হতে দেননি। বর্তমানে পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তিত। ভারত- ইজরায়েল এখন ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা সহযোগী।

এবার আসা যাক আমেরিকার কথায়। সেখানে নতুন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সদ্য পদ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ভাবে প্রচারের শুরুর দিন থেকেই তিনি ইসলামি কট্টরবাদকে ধ্বংস করার কথা বারবার বলেছেন তা অনেক কিছুরই ইঙ্গিত বহন করছে। আর শপথ গ্রহণের প্রথম সাতদিনের মধ্যে যেভাবে সাতটি মুসলমান-অধ্যুষিত দেশের নাগরিকদের 'আগামী ৯০ দিন আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না' বলে 'শরণার্থীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা' জারি হয়েছে তাতে দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। উল্লেখ্য, ট্রাম্প কিন্তু স্পষ্ট করে দিয়েছেন শরণার্থী নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন খ্রিস্টান, হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের। ট্রাম্পও তাঁর পূর্বতন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সরাসরি মুসলমান তোষণের অভিযোগ এনেছেন। তিনি আমেরিকায় মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে ভোটের প্রচারের শুরু থেকেই ছিলেন একবগ্গা এবং প্রচার লগ্নে বিশ্বের সব মুসলমানকে সন্ত্রাসবাদী তকমাও দিয়েছেন। অন্যদিকে রিপাবলিকান হিন্দু কোয়ালিশনের সভায় প্রদীপ জ্বালিয়ে হিন্দু রীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। নিজেকে বিগ বিগ ফ্যান অফ হিন্দু, ফ্যান অব ইন্ডিয়া বলেও ঘোষণা করেছেন। তাঁর পুত্র ভোট প্রচারের শেষলগ্নে হিন্দুমন্দিরে গিয়ে হিন্দু রীতিতে পুজো পর্যন্ত করেছেন। আমেরিকার প্রশাসনের প্রধান হিসেবে যে ভাবে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের আমেরিকার প্রশাসন, বাণিজ্য ও কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। রাষ্ট্রসঙ্ঘে আমেরিকার দূত নিক্কি হ্যালে, ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশনের চেয়ারম্যান অজিত পাই, মার্কিন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রশাসনের প্রধান সীমা ভার্মাকে নিয়োগ করে ট্রাম্প সরাসরি ভারতকে সহযোগিতার বার্তা দিয়েছেন। ট্রাম্পের ঘোষণা, 'ভারত- আমেরিকার সম্পর্কের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনো সম্পর্ক হতে পারে না।' এই একটি লাইনের মধ্যেই চীন ও পাকিস্তানকে ট্রাম্প যা বলার বলে দিয়েছেন বলে কূটনীতিকদের মত। বিশ্ব রাজনীতির বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প ও মোদীর মধ্যেকার রসায়নও অনুকূল। ট্রাম্প বহুবার মোদীকে বিশ্বনেতা বলে সম্বোধন করেছেন এবং নিজেও মোদী থেকে অনুপ্রাণিত বলে ঘোষণা করেছেন। ইন্ডিয়া ফার্স্ট-এর আদলে আমেরিকা ফার্স্ট বা মেক ইন ইন্ডিয়ার আদলে মেক আমেরিকা গ্রেট এগেনকে কপি করা বললে ভুল হবে না। অনেকে আবার তাঁর শরণার্থী নীতিকেও মোদী থেকে অনুপ্রাণিত মনে করছেন। কারণ মোদী সরকারও তার নতুন নাগরিকতা বিলে সারা বিশ্বের অত্যাচারিত হিন্দুদের ভারতের নাগরিকতা পাওয়ার সহজ পথ দেখিয়েছে। আবার দুই শাসকই তাঁদের পূর্ববর্তী শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলমান তোষণের অভিযোগ এনেছেন। অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলই, কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির বিশ্লেষকদের চমকে দিয়ে শপথ গ্রহণের প্রথম চারদিনের মধ্যেই যে ভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করে ভারতের সঙ্গে আমেরিকা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একজোট হয়ে সন্ত্রাসবাদ-সহ তাবৎ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে লড়াই করার কথা বলেন এবং এই সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন তা এককথায় বিশ্ব কূটনীতিতে বিরল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার আগেই তিনি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে নেন। পরে হোয়াইট হাউসে জানান, 'ভারতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমেরিকা অঙ্গীকারবদ্ধ'। উল্লেখ্য, ভারত ও ইজরায়েলের সঙ্গে কথা বলার আগে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যে দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে কথা বলেছেন সেই দুই দেশই আমেরিকার প্রতিবেশী মেক্সিকো ও কানাডা। ইঙ্গিত আগেই ছিল, ফলে চীন পাকিস্তানের মতো দেশ ট্রাম্প-মোদীর এই কূটনীতির সামনে চিৎপটাং।

উল্লেখ্য, বিশ্ববাসীর সামনে আই এস আই এসের থেকেও চিন্তার বিষয় ৫২টি মুসলমান দেশের সৈন্যজোট। যে সৈন্যজোটের মাথা প্রাক্তন পাকসেনা প্রধান রাহিল শারিফ। মুখে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য এই সেনা গঠনের কথা বলা হলেও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা অশনি সংকেত দেখছেন। জেহাদি ইসলামের ইতিহাস তার সাক্ষী। এজন্য এই নতুন শক্তিজোট জরুরি বলে বিশেষজ্ঞদের মত। শেষে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ওবামার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— 'আগামী দিনে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি একজন হিন্দুও হতে পারেন'। ইঙ্গিত স্পষ্ট। ■

চিঠিপত্র

ভাঙড়ে কি সিঙ্গুরের ছায়া?

পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্র-বিরোধিতা দীর্ঘদিনের। এ রাজ্যে ৩৪ বছরের বাম শাসনকালে বামদলগুলি এবং সরকার দিল্লির দিকে তর্জনি উঁচিয়ে 'দিচ্ছে না', 'দিচ্ছে না' রবে চিলচিৎকার করত। রাজ্যবাসীকে ভুল বুঝিয়ে বামনেতা-মন্ত্রীরা তাদের করে তুলতেন দিল্লি বিরোধী। অধিকাংশ রাজ্যবাসীর মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হোত যে সত্যিই বুঝি দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যকে বঞ্চিত করছে। রাজ্যের সঙ্গে করছে বিমাতৃসুলভ আচরণ। আর এভাবেই বামেরা রাজ্যের মানুষকে কেন্দ্র বিরোধী করে ও খেপিয়ে টানতো নিজেদের দিকে এবং সেই কেন্দ্র বিরোধী মনোভাবকে পুঁজি করে ভোটে মারত দাঁও। তারা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে আঞ্চলিকতাবাদের বিষ।

বামেদের ক্ষমতা থেকে হটিয়ে ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধায়ের নেতৃত্বে যে তৃণমূল ক্ষমতায় এল তারাও অনুসরণ করতে থাকল পূর্বসূরিদের নীতি। তারাও কিছুদিনের মধ্যেই ধুয়ো তুলল— 'দিল্লি দিচ্ছে না', 'দিল্লি দিচ্ছে না'। এইভাবে তারাও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে ভুল বুঝিয়ে খেপিয়ে তুলছে। যেমন সম্প্রতি নোট বাতিলের বিরুদ্ধে তারা মানুষকে উত্তেজিত ও কেন্দ্রবিরোধী করে তোলার চেষ্টা করছে। উদ্দেশ্য সেই একই। লোক খেপিয়ে ভোটে দাঁও মারা। সত্যিটা হচ্ছে এই যে বিগত সরকারের সব ঋণ শোধ করতে হয় বর্তমান বা ক্ষমতাসীন সরকারকে। আর এটাই হচ্ছে সাংবিধানিক রীতি। সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই এ রীতি প্রযোজ্য। তাই ঋণ নিয়ে মমতা সরকারের কেন্দ্র বিরোধী বিষোদগার শেয়ালের হুক্কাহুয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া ক্ষমতায় এসে মমতা সরকার যেভাবে খেলা, মেলা, উৎসব, মোচ্ছব, দান, খয়রাতি করছে সরকারি টাকায় তাতেই সরকারি কোষাগারের অবস্থা 'ভাড়ে মা ভবানী'। অর্থাৎ কোষাগার প্রায় শূন্য। আর সেই কোষাগার ভরতি করতে সরকার বাজার থেকে ঋণ নিচ্ছে মাসে হাজার হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার তো দানসত্র খুলে বসেনি যে যখন তখন চাইলেই পাওয়া যাবে। কেন্দ্র থেকে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত রাজ্যের টাকা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের তাগিদে যদি সরকার নয়ছয় করে তবে রাজ্যের উন্নয়ন যে যাবে বিশ বাঁও জলে তা তো বলাই বাহুল্য। এতে কেন্দ্রের দোষটা কোথায়?

একদা মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়েছে টাটাদের। চাষিদের ভুল বুঝিয়ে, খেপিয়ে। পুলিশের গুলিতে হতাহত হয়েছে বহু আন্দোলনকারী। আর আজ বামেদের নেতৃত্বে ভাঙড়ে চাষিরা আন্দোলন করছে পাওয়ার গ্রিডের বিরুদ্ধে। এবারও পুলিশের গুলিতে হতাহত কিছু আন্দোলনকারী। তবে কী এটা শেষের শুরু?

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

বিমুদ্রীকরণ

আমার একটি রচনা 'প্রচ্ছদ-নিবন্ধ' হিসাবে ৩০ জানুয়ারি সংখ্যায় 'এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের পটভূমি' মুদ্রণের জন্য সবিশেষ ধন্যবাদ জানাই। দুটি ভুল নজরে এল।

১. 'উত্তরপ্রদেশের মেহেরানা গ্রামের' (১৫ পৃ.) স্থানে উত্তর প্রদেশের 'কাইরানা শহরের'— হলে ঠিক হবে।

২. 'বিমুদ্রাকরণের'— কথাটি হবে 'বিমুদ্রীকরণ'। লক্ষ্য করছি, বাংলার সংবাদপত্রগুলি শব্দটি ভুল ভাবে লিখছে। 'স্বস্তিকা'তেও ভুল ছাপা হচ্ছে। আমার শব্দটি সে-কারণেই হয়তো সম্পাদিত হয়েছে। এটি ঠিক নয়— ব্যাকরণ সম্মত নয়। আগে ছিল না এখন হয়েছে— এই শব্দটি □ কৃ □ ভু ইত্যাদি ধাতুর আগে অদ্ভুতভাবে চ্বি-প্রত্যয়যোগে তৈরি। চ্বি-প্রত্যয়ে দীর্ঘ-ঈ-কার রাখা জরুরি। সমীকরণ, সমীভবন, শিলীভবন জাতীয় বহু শব্দের মতো 'বিমুদ্রীকরণ' হওয়া উচিত।

হিন্দীতে বিমুদ্রীকরণ-ই বলা হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষার উত্তরাধিকার মেনে শব্দটির বানান সংশোধন কর্তব্য।

—অচিন্ত্য বিশ্বাস,
গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৯৪।

হিন্দুত্বকে এত ভয় কেন?

সিন্ধু থেকে এসেছে হিন্দু। আর হিন্দু থেকেই এসেছে হিন্দুস্থান। আবার হিন্দু থেকে এসেছে হিন্দ, পরবর্তীতে ইন্ডিয়া। এই নামগুলো কোনটিই হিন্দুদের দেওয়া নয়। বিদেশিদের কাছ থেকে পাওয়া। বরং 'ভারত' নামটি আমাদের একান্ত নিজস্ব। পৌরাণিক 'ভরত' নাম থেকেই ভারত শব্দটির উৎপত্তি। আর 'ভারত' শব্দটি উচ্চারণেই আমাদের হৃদয় বেশি উদ্বেলিত হয়। আমরা ভারতীয় অথবা ভারতবাসী এই শব্দ উচ্চারণেই আমাদের সবার প্রাণ কমবেশি উচ্ছ্বসিত। তবে 'হিন্দু' কথাটি উচ্চারণেও কি কোনো গৌরব নেই? একদা এই হিন্দুদের উৎসভূমি সরস্বতী নদীর তীরে বসবাসকারী ঋষিদের মুখেই তো প্রথম বেদ উপনিষদের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। শান্ত সমাহিত সেই তপোভূমি কী পবিত্রতাতেই না ভরপুর ছিল। এখনও সেই ঋষিভূমিতে পবিত্র শান্তি বিরাজিত। গঙ্গাতীরবর্তী ঋষিকেশ হরিদ্বার বারাণসী নবদ্বীপ কিংবা কলকাতার দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে গেলে মানুষ কি প্রাণে প্রাণে পবিত্র শান্তি অনুভব করেন না? করেন বলেই তারা ছুটে যান প্রাণের টানে আনন্দের রসাস্বাদনে। এর সবগুলিই হিন্দুতীর্থক্ষেত্র। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠেও গীত হয়েছে উপনিষদের প্রার্থনাসঙ্গীত। মহাত্মা গান্ধীও একদা রঘুপতি রাঘব রাজারামের বন্দনাসঙ্গীতে বিভোর থাকতেন।

তাহলে আজ হিন্দুদের হিন্দুত্ব নিয়ে তথাকথিত ছদ্মধর্মনিরপেক্ষ- বাদীদের এত বাগাড়ম্বর কেন? হিন্দুত্বকে তারা ভয় পান কেন? নাকি হিন্দুত্বকে ঘৃণা করেন? অন্য

ধর্মালম্বী বিদেশিরা অনেকবার হিন্দুত্বের লাঞ্ছনা করেছে। এখন করছে তাদের দোসর। ‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামারা’— কবি ইকবালের এই গানের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভারতবাসীর স্বকীয়তা। হিন্দুত্ব এদেশের সংস্কৃতি। আর সেই সংস্কৃতিতে আছে দেবদেবীর পূজা, প্রকৃতি পুজো, সূর্য প্রণাম, গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা, গোরুকে গোমাতাজ্ঞানে পূজা অথবা অন্য সংস্কৃতিকে সম্মান জানানো। আজ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে যেভাবে হিন্দু নির্যাতন হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীসহ বাম-ডান রাজনৈতিক নেতাদের সেই নির্যাতন বন্ধে অবশ্যই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় প্রচুর হিন্দু মারা গিয়েছিলেন এবং তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সোহরাবর্দি। এই দাঙ্গার মূল উদ্যোগী ছিল মুসলিম লীগ। আর পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সেই হিন্দুত্বেরই মুখ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। যদিও শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুত্বের থেকেও কত বেশি মানবতাবাদী বা মানবদরদি ছিলেন তা তাঁর জীবন নিয়ে করা আগামীদিনের গবেষণাই বলে দেবে।

—**বারিদবরণ বিশ্বাস,**
বড়জোড়া, বাঁকুড়া।

বিশ্বের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর

‘স্বস্তিকা’ পূজা সংখ্যায় (২০১৬) অমলেশ মিশ্র রচিত ‘বিশ্বের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর’ শিরোনামে দীর্ঘ রচনাটি পড়লাম। যেখানে গত প্রায় দুশো বছরের আধুনিক বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সারস্বত এবং আধ্যাত্মিক জগতের মূর্ধণ্য শ্রেণীর মনীষী, মহাপুরুষ, জগৎবরেণ্য ঈশ্বরকোটির পুরুষ এবং অবতারকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তুলনায় নানা মানদণ্ডে ন্যূন জ্ঞানে দ্বিতীয় স্থানাভিষিক্ত করা হয়েছে। ব্যক্তি বা কোনো কিছুর মূল্যায়ন কালে অবমূল্যায়ন বা অতিরঞ্জন দুই-ই আলোচ্যের নিরপেক্ষ বিচারের পরিপন্থী। ফলে আলোচনা তার প্রাপ্য গুরুত্ব হারায়। আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোনো যোগ্য ব্যক্তিত্বের প্রতি কারও বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিবশত পক্ষপাতিত্ব অস্বাভাবিক না হলেও তুলনার প্রশ্নে কতকগুলো শর্ত অবশ্য মান্য। বিশেষ করে কালের দাবিতে বিশ্বকে গ্লানিমুক্ত করে ধর্ম প্রতিষ্ঠায় যাঁদের মর্ত্যে অবতরণ তাঁদেরকেও পংক্তিভুক্ত করে এক আঞ্চলিক সমাজ- সংস্কারের নিম্ন পর্যায়ভুক্ত করা অসমীচীন বলে মনে হবেই। এযাবৎ শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দই বিদ্যাসাগর সমেত ঊনিশ শতকের সংস্কারকদের উদ্দেশ্যে বললেন : ‘সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই আমি তাঁদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান। আমি চাই আমূল সংস্কার। ...তাঁদের প্রণালী ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলা, আমার পদ্ধতি সংগঠন। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।’ বিদ্যাসাগরের খ্যাতি ও স্বীকৃতি মূলত তাঁর সংস্কার কর্মনির্ভর যে ব্যাপারে তিনি ইংরাজ প্রশাসনের পুরো পৃষ্ঠপোষকতা ও সমসাময়িক ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভে ধন্য ছিলেন। অন্যথায় সনাতন ধর্ম ও পরম্পরাকে উচ্ছিন্ন করে পাশ্চাত্যের আপাত যুক্তিবাদী এবং স্থূল ভোগবাদকে স্থলাভিষিক্ত করতে বিদ্যাসাগরের একক প্রচেষ্টায় ছিল অসম্ভব। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিনিধি মেকলে সাহেব ভারতীয় ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধ্বংস লক্ষ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন-সহ ভারতীয়দেরই মাধ্যমে সমাজসংস্কারে সচেষ্ট হন। উত্তরাধুনিক যুগে বাস্তবের প্রমাণে ওই সংস্কারগুলোর প্রাসঙ্গিকতা শেষ এবং তাঁদের পুনর্মূল্যায়নের সময় এসেছে। কারণ অমোঘ এক ইংরেজি প্রবচন হলো : ‘Intellectual triumphs of one age are the follies of another’, (কোনো বিশেষ যুগের আকাশচুম্বী ঐতিহাসিক কৃতিত্বও কাল পরিবর্তনে গৌরবচ্যুত হয়।) মানবসমাজের উন্নতির জন্য জাগতিক প্রচেষ্টা স্বাগত হলেও ‘শিক্ষাই বল আর দীক্ষাই বল, ধর্মহীন হইলে তাহাতে গলদ থাকিবেই থাকিবে’— স্বামীজী। অনস্বীকার্য ভাবে বর্তমানের সার্বিক নৈরাজ্য ও নৈতিক স্খলন ঊনিশ শতকের ধর্মবিরোধী সংস্কার কর্মের ফলশ্রুতি। ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব সত্ত্বেও তার মাধ্যমে আগত ভোগবাদী সংস্কৃতির দুর্দমনীয় অভিঘাত হিন্দুর পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্মের মূলে আঘাত করেছে। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে আদর্শ জ্ঞানে ভারতের ত্যাগমন্ত্রের জীবনকে পরিহারের প্রচেষ্টায় ভস্মে ঘি ঢালার চেয়েও মারাত্মক ও বিপজ্জনক হয়েছে। তাঁর ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধির যাথার্থ বিচার্য ‘বিদ্যা’ শব্দের ‘সংজ্ঞার বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে’ এই আধ্যাত্মিক ‘পরা’ বিদ্যার প্রেক্ষায়, যার সঙ্গে এক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীর সম্পর্ক চিন্তা অযৌক্তিক। শেষ জীবনে বিদ্যাসাগরের রাজহংসের শোকসঙ্গীত ছিল ‘আমি ধনে প্রাণে মারা গেলাম।’

—**অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়,** তারকেশ্বর, হুগলী।

দেবাদিদেব শিবঠাকুর

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

দেবতাদের মধ্যেও 'ইগো' থাকে। পুরাণকার সেইভাবেই উপস্থাপিত করেছেন। নইলে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু বেশ দিব্যি ছিলেন, সৃজনে, পালনে। একজন সৃষ্টি করছেন আর একজন পালন করছেন, যাঁর যা কাজ। হঠাৎ একদিন দু'জনের মধ্যে শুরু হলো দ্বন্দ্ব। ব্যক্তিত্বের সংঘাত। কে বড়ো, এ জগতে কার বেশি গুরুত্ব। ব্রহ্মা বলেন আমার। বিষ্ণু বলেন আমার। প্রথমে তর্ক, বিতর্ক, উত্তপ্ত বাদানুবাদ। শেষে পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠল, দু'জনে তাল ঠুকে মাঠে নেমে পড়লেন। শুরু হলো যুদ্ধ। ব্রহ্মা বিষ্ণুর মধ্যে যুদ্ধ। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন। সময় গড়িয়ে যায় অনন্তের দিকে। কিন্তু যুদ্ধ থামে না। জগৎ রসাতলে যায়। দেবকুল চিন্তিত, বিমর্ষ। উপায় কী? ঠিক এই সময় বিচিত্র ব্যাপার ঘটলো। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মাঝে এক বিরাট অতিকায় জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভূত হলো। দৈববাণী হলো— তোমরা যুদ্ধ বন্ধ কর। যে এই লিঙ্গের পরিমাপ করতে পারবে, সেই হবে শ্রেষ্ঠ।

এবার লড়াই থামিয়ে ব্রহ্ম আর বিষ্ণু দু'জনেই বেরিয়ে পড়লেন। একজন গেলেন উৎসের সন্ধানে, অপর জন শেষ দেখতে। কিন্তু আখেরে কিছুই হলো না। দুজনেই ক্লান্ত, শ্রান্ত শরীরে, ভগ্ন মনে ফিরে এলেন। না পেলেন উৎস, না পেলেন শীর্ষ। তখন নিজেদের সীমাবদ্ধতায় সংকুচিত হয়ে নতজানু হয়ে করজোড়ে সেই জ্যোতির্লিঙ্গের আরাধনা করতে লাগলেন। তাঁদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে লিঙ্গের উপরে আবির্ভূত হলেন— শুভ্রকায়, জ্যোতির্ময় দেবাদিদেব শিব। ব্রহ্মা আর বিষ্ণু মেনে নিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। তিনিই দেবতাদেরও দেবতা। তিনি মহাদেব, তিনিই দেবাদিদেব। তিনি জানালেন— তাঁর এই জ্যোতির্ময় রূপ সাধারণের সহ্য হবে না, তাই তিনি লিঙ্গরূপে বিরাজ করবেন। আর এই লিঙ্গ শরীরকে পরমাত্মা জ্ঞানে পূজা করলেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

এই কাহিনি স্কন্দপুরাণের। কিন্তু আমাদের অন্যান্য পুরাণেও শিবঠাকুরের কথা কিছু কম নেই। তাঁকে নিয়ে মস্ত একটি পুরাণ তো আছেই। এছাড়াও প্রায় সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই শিবের সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের যেমন 'কানু ছাড়া গীত নেই', তেমনি আবার আমরা ধান ভানতে গিয়েও 'শিবের গীত' গাই। কারণ তিনি আমাদের বড়ো প্রিয় দেবতা, আমাদের বড়ো আপনজন। তিনি সন্ন্যাসীর যেমন আরাধ্য, তেমনি গৃহস্থেরও আদর্শ। তাঁর কোনো বালাই নেই। গায়ে শ্মশানের ছাই মাখেন, চড়েন বুড়ো ষাঁড়ের পিঠে, মাথায় জটা, সর্পভূষণ, সঙ্গী ভূত প্রেত, শ্মশানে-মশানে ঘোরেন, কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তাঁর এই উদাসীন আত্মভোলা অনাড়ম্বর রূপ সন্ন্যাসীদের আকৃষ্ট করে। তাই একালের বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন— হে ভারত ভুলিও না, তোমার উপাস্য সর্বত্যাগী শঙ্কর,...।

আবার তিনিই পতি হিসেবে উমাগত প্রাণ। সতীর বিরহে প্রলয় নৃত্য শুরু করে দেন। একদিকে তিনি যেমন আশুতোষ, অপরদিকে তাণ্ডব নৃত্যে ত্রিভুবনকে ধ্বংস করে দেন এক নিমেষে। একদিকে তিনি যেমন কল্যাণসুন্দর, অপর দিকে তিনি রুদ্র। বৈদিক যুগে তিনি রুদ্ররূপেই বন্দিত। তিনিই প্রথম। তাঁর পূর্বে কেউ নেই। তিনি অনাদি। তিনি শাসন করেন। তিনি বিশ্বচরাচর চালিত করেন। ঐতরেয় উপনিষদ অনুসারে তাঁর ভীষণতা এতটাই ভয়ঙ্কর— যে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে ভয় হয়। কিন্তু তিনি শুধু ভীতিপ্রদ নন, তিনি আমাদের ঔষধ দান করেন। তাঁর কৃপায় আমরা আরোগ্য লাভ করি, সুস্থ থাকি। আর্য ঋষির প্রার্থনা— হে রুদ্র, তুমি ভীষণ। তুমি আমাদের গো, অশ্ব, ও পুরুষকে ভেষজ প্রদান কর।

পরবর্তীকালে আমরা পেলাম মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। অকালমৃত্যুর হাত থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তিনি মহাকাল। আবার তাঁর আরাধনা করলে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকেও চিরমুক্তি লাভ হয়। 'পুনরপি জন্মং পুনরপি মরণং' থেকে মুক্তি। আবার কাশীধামে মৃত্যু হলে কথাই নেই, স্বয়ং শিব মৃতের কানে তারকব্রহ্ম নাম দিয়ে তার অষ্টপাশ খুলে দেন। জীব লাভ করে শিবত্ব। ঘুচে যায় পশুত্ব। যারা তাঁর আশ্রিত, তাদের চিন্তা নেই। পাপিষ্ঠ হলেও নরকগামী হয় না। তিনি এতই দয়ালু। তাই, শিবপূজকের কোনো কিছুর ভয় থাকে না। আর তাঁর পূজার বিশেষ উপচারের প্রয়োজনও নেই। সবাই জানে, তিনি একটি বেলপাতাতেই তুষ্ট। একটি বেলপাতা আর একটু গঙ্গাজল। সঙ্গে ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্র। এই সঙ্গে অবশ্যই যা প্রয়োজন তা হলো শ্রদ্ধা, ভক্তি।

তবে বেলপাতা, গঙ্গাজলে যেমন তিনি তুষ্ট হন, তেমনি অন্যান্য উপচারেও তাঁকে পূজা করে মনের মতো বর পাওয়া যায়। শিবপুরাণে তার বিস্তৃত তালিকা লিপিবদ্ধ আছে। ধুতুরা ফুল দিয়ে পূজা করলে পুত্রলাভ হয়। ধুতুরা অনেক রকম হতে পারে। লাল বর্ণের ধুতরা সর্বোত্তম। ঘৃতের মাধ্যমে পূজা করলে ক্লীবত্ব দূর হয়। দূর্বাঘাসে আয়ু বৃদ্ধি পায়। বকফুল দিয়ে পূজা করলে যশলাভ হয়। তুলসী পত্রে ভোগ ও মোক্ষ দুই হয়। আকন্দফুল দিয়ে, রক্তজবা দিয়ে পূজা করলে শত্রু বিনাশ হয়। করবী ফুলে আরোগ্য লাভ হয়। বন্ধুক পুষ্পে অলংকার লাভ হয়। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিবান তাঁরা অতসী ফুল দিয়ে শিবের পূজা করবেন। যে পুরুষ কল্যাণময়ী পত্নী চান তিনি মল্লিকা ফুল দিয়ে শিবের পূজা করবেন। কোনো নারী যদি যুথিকা ফুলে শিবের আরাধনা করেন, তবে তার গৃহ

শস্যহীন হয় না। তিল, তণ্ডুল শিবের বড়ো প্রিয়। তিল দিয়ে পূজা করলে মহাদেব তাকে মুক্তি দেন। তণ্ডুল দান করলে দাতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। লক্ষ তিল দানে মহাপাপ থেকে মুক্তি মেলে। গঙ্গাজল যে শিবের বড়ো প্রিয় তা সবাই জানে। গঙ্গাজলের ধারাস্নান করিয়ে পূজা করলে পূজক মোক্ষ লাভ করে। মধুর মাধ্যমে পূজা করলে বাত-শ্লেষ্মার কষ্ট দূর হয়। ইক্ষুরস শিবের বড়ো প্রিয়। ইক্ষুরস দানে জীবের সব দুঃখ দূর হয়।

শিবপূজায় সব ফুলের কদর থাকলেও কেতকী আর চাঁপা এই দুটি ফুল ব্রাত্য। কেতকী ও চাঁপার মতো সুন্দর সুগন্ধ যুক্ত ফুল বাতিল করে শিব বেছে নিয়েছেন গন্ধহীন বর্ণহীন ধুতুরা ফুল। না আছে তার রূপ, না আছে কোনো গুণ। বরং তীব্র বিষযুক্ত। সমুদ্র মন্থনের ফলে উদ্ভূত হলাহল পানের মতোই জটায় ধারণ করেছেন দেবসভায় অনাদৃত বিষপূর্ণ ধুতুরা পুষ্প।

শিব কিন্তু সব দিক দিয়েই ব্যতিক্রমী। শিব বলাতে আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে ধ্যানরত যোগীর ছবি। নির্বাত নিষ্কম্প দীপ শিখার মতো অচঞ্চল এক মহাযোগী। তাঁর মনে কামনা সৃষ্টি করতে স্বয়ং কামদেব হাজির, সঙ্গে সখা বসন্ত। জেগে উঠলেন মহাযোগী, আর জ্বলে উঠল তাঁর তৃতীয় নয়ন। ধ্বক্ ধ্বক্ লেলিহান আগুনের শিখা। তখন দিব্যরূপ মদনের, তা হয়ে গেল একমুঠো ছাই।

কোনো নারীই ছলাকলা দেখিয়ে তাঁর ধ্যান ভাঙতে পারেনি। ব্রহ্মার কথায় বিশ্বকর্মা তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করলেন। তিল তিল রূপ নিয়ে তিলোত্তমা। ভয়ানক সুন্দরী। তাঁকে দেখার জন্য ব্রহ্মা অধৈর্য হয়ে পড়েন, তাঁর চারদিকে চারটি মুখ জন্মাল। ব্রহ্মা হলেন চতুর্মুখ। দু'চোখে দেখে তৃপ্তি নেই, তাঁর হলো সহস্র নয়ন। একমাত্র শিব-ই রইলেন স্থির। তাই তাঁর নাম হলো 'স্থাণু'।

'এই মহাযোগীকে বাদ দিয়ে আমাদের কোনো কাজ সুন্দর হয় না। কারণ, তিনি সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর এই গুরুত্বের কথা ভেবে বাংলা ভাষায় 'শিবহীন যজ্ঞ' বলে একটা প্রবাদই সৃষ্টি হয়েছে। তাই, যে দেবতার পূজা করা হোক না কেন, প্রথমে পঞ্চদেবতার পূজা করার বিধি মানতে হয়। আর শিব হলেন এই অংশপূজ্য পঞ্চদেবতার অন্যতম। কিন্তু সত্য শিব সুন্দরের আরাধনার জন্য আমরা বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনকে ধার্য করেছি। সেটি হচ্ছে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। যাকে বলে শিবরাত্রি। সাধারণ মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, শিবরাত্রির ব্রত করলে মেয়েরা ভালো বর পায়। তাই শিবরাত্রি ব্রত করার ঝোঁক মেয়েদের মধ্যেই বেশি। এদিন মেয়েরা দলে দলে গিয়ে বাবার মাথায় ফুল, বেলপাতা, দুধ, গঙ্গাজল ঢালে। কিন্তু শিবরাত্রির মাহাত্ম্য শুধু মনের মতো বর পাওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, এর তাৎপর্য আরও গভীর। আমাদের আবার গল্পে যেতে হবে।

এক ঘন বনের ধারে এক ব্যাধের বাস। পশু হত্যাই তার জীবিকা। অন্যান্য দিনের মতো ব্যাধ শিকারে বেরিয়েছে। বনের মধ্যে চলছে পশুর সন্ধান। কিন্তু কি দুর্দৈব! কোনো পশুর দেখা নেই। এ দিকে কখন যে সূর্য ডুবে গেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে, সে জ্ঞানও নেই। খেয়াল হতেই বুঝল, সে চলে এসেছে অনেক ভিতরে। এখন ঘরে ফেরা কঠিন। রাতটা বনের মধ্যেই কাটাতে হবে। তখন ব্যাধ কাছেই একটি গাছে উঠে নিজের শরীরকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিল কিন্তু ঘুম কি আসে? গাছে শুয়ে শুয়ে ব্যাধ ভাবে তার ঘরের কথা। আজ শিকার হলো না। তার সন্তানদের মুখে কোনো খাবার জুটল না। তার স্ত্রী, সন্তানরা এখন কী করছে ভারতে ভাবতে ব্যাধের চোখ দুটি জলে ভরে এল। আর চোখের জলের সঙ্গে গাছের একটি পাতা খসে পড়ল নীচে। সেটি ছিল বেল গাছ। গাছের নীচে ছিল শিবলিঙ্গ। ব্যাধের সারাদিন কোনো খাবার জোটেনি। ছিল উপবাসী। রাতটি ছিল শিবরাত্রি। ফলে অভুক্ত ব্যাধের চোখের জলের সঙ্গে বিল্বপত্র শিবরাত্রিতে শিবলিঙ্গের উপর পতিত হওয়ায় ব্যাধের শিব চতুর্দশীব্রত করা হলো, আশুতোষ শিব বড় সন্তুষ্ট হলেন।

কালে, ব্যাধ যখন মৃত্যুমুখে পড়ল তখন যমদূতরা এল তাঁকে নিতে। সারা জীবন নির্বিবাদে পশু হত্যা করেছে, স্বভাবতই তার উপর তো যমদূতদের অধিকার বর্তায়। কিন্তু বাধ সাধল শিবদূতেরা। তারা তাকে নিয়ে চলে এল শিবলোকে। যমদূতরা কিন্তু তাদের অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। পেছনে পেছনে চলে এল তারাও। দ্বারে ছিলেন নন্দী। তিনি ব্যাধের দ্বারা কৃত শিবরাত্রির ব্রতের কথা যমদূতদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। তারা যমলোকে ফিরে গেল।

স্বয়ং শিবের মুখে পার্বতী শিবরাত্রির কথা ও মাহাত্ম্য শুনেছিলেন। সদাশিব বলছেন : 'প্রিয়ে! একাগ্রচিত্তে ভক্তি সহকারে শিবরাত্রিতে কেবল বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল দিয়ে আমার পূজা করলে যে রূপ পুণ্য সঞ্চয় হয় অন্য কিছুতে তাদৃশ ফল লাভ হয় না। শিবপুরাণ অনুযায়ী, সমস্ত শাস্ত্রালোচনা, অনেক ধমকর্ম, নানা ব্রত, বহু তীর্থগমন, প্রচুর দান-ধ্যানে যা পুণ্য হয় তা শিবরাত্রি ব্রতের তুল্য নয়'। আর এই জন্য আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শিবরাত্রি ব্রতের এত সমাদর। বাংলার মানুষ তাদের জীবনচর্যায় যে কয়েকটি ব্রত, পূজার অনুষ্ঠানকে অপরিহার্য ভাবত, তাদের মধ্যে শিবরাত্রিও অন্যতম। তাই খনার বচনে ব্যক্ত হয়েছে : 'শোয়া ওঠা পাশ মোড়া/তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া। খ্যাপার চৌদ্দ খেপীর আট/এই নিয়ে কাল কাট।'

খেপী দুর্গা অর্থাৎ দুর্গাষ্টমী, আর খ্যাপা অর্থাৎ ভোলানাথ শিব; তাঁর চতুর্দশী অর্থাৎ শিররাত্রি। সব মিলিয়ে এই দেবতার তুলনা নেই। অমন যে ভক্ত পুষ্প দন্ত, তিনি নানাভাবে আরাধ্য দেবতার স্তব স্তুতি করলেন। কিন্তু আশ মিটল না। তাই শেষে ভারি সুন্দর স্বীকারোক্তি :

অসিত গিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্খী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং নযাতি।

হে শিব, নীল পর্বত যদি কালি হয়, সাগর যদি হয় মসিপাত্র, পারিজাতের শাখা শ্রেষ্ঠ লেখনি, পৃথিবী পত্র, দেবী সরস্বতী স্বয়ং লেখিকা এবং তিনি চিরকাল লিখে চলেন তা হলেও তোমার গুণরাশির সীমা অতিক্রম করা যাবে না।

আমরা সেই করুণাময় আশুতোষ শিবের উদ্দেশে প্রণাম জানাই— ওঁ নমঃ শিবায়। আর প্রার্থনা : হে পূর্ণস্বরূপ, হে প্রভু, তুমি প্রসন্ন হও— 'প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপঃ'।

গীতার ধর্ম নিবৃত্তিমূলক, ত্যাগই তার মর্মকথা

পরম্পরা

সুনীল কুমার দাস

গীতার ধর্ম বুঝতে হলে, জানতে হবে— ধর্ম কী? এর প্রয়োজন কতখানি আর কীভাবে এই ধর্মলাভ করা সম্ভব? ধর্ম হলো সেই সত্তা যা চরাচর বিশ্বকে ধারণ করে রেখেছে। যার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত রক্ষিত ও পরিচালিত হচ্ছে। যার অমোঘ শক্তি স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত কিছুকেই সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করছে। আসলে যা

কিছু সম্ভাবনাময়, অস্তিত্ববান তার সমস্তটাই তার দ্বারা ধৃত বলেই ধর্ম। অনেকে ধর্মকে ইংরেজি রিলিজিয়ান শব্দের সমার্থক বলে মনে করেন। রিলিজিয়ান হলো কোনো মতবাদ প্রসূত উপাসনা পদ্ধতি বা অনুষ্ঠান বিশেষ। একজন হিন্দু বৈদান্তিক কিছুতেই ধর্মকে এত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন না। তাঁর কাছে ধর্ম হলো স্বভাব। স্ব অর্থাৎ তার নিজের, ভাব অর্থ বিদ্যমানতা বা উপস্থিতি। এই স্বভাবই তার প্রকৃতি। তার আসল স্বরূপ। যা আছে এবং ছিল বলেই আছে, আরও বলা যেতে পারে যে অবশ্যই তার নিজ স্বভাব গুণেই আছে। যেমন জল তার স্বভাব গুণেই নীচের দিকে গড়িয়ে যায়— এটিই তার ধর্ম। একইভাবে বলা যায় বাতাস শোষণ করে, আগুন পুড়িয়ে দেয়। মানুষও তার পারমার্থিক সত্তা, তার মনুষ্যত্ব, তার দেব প্রকৃতি, সর্বোপরি তার নিজস্ব ব্রহ্মভাব তার নিজ স্বভাব গুণেই ধারণ করে রেখেছে। এটিই তার ধর্ম। এটিই তার নিজস্ব প্রকৃতি। মোট কথা ধর্ম হলো তার স্বকীয়তা, উপস্থিতি, বিদ্যমানতা। 'যা নাই তা কখনই ছিল না। যা আছে তা সব সময়ই আছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসব জানেন।'

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।। গীতা ২/১৬

এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে— যার দ্বারা সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত, চালিত ও রক্ষিত তাকে নিয়ে আবার আলাদা করে ভাবার প্রয়োজন কী? উত্তরে বলব— আমরা মানুষ মর্ত্যলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। তাই আমরা আমাদের স্বরূপ জানতে চেষ্টা করি। বুঝতে চাই এই জগৎ, এই জীবনকে। জগৎ-জীবনের আড়ালে যে পরমার্থিক সত্তা আছে, তাঁকে। কিন্তু কেন এই আড়াল? কেন তাঁর স্বরূপ গোপনীয়তার দুর্ভেদ্য আবরণে ঢাকা? হয়তো এটি তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা—আমরা তাঁকে যত্ন করে খুঁজে বের করি। এই লুকোচুরি, এই গোপনীয়তা তাঁর কাছে একটি কৌতুক। একটি মজার খেলা। এই খেলাই তিনি খেলে চলেছেন আবহমান কাল ধরে। এই খেলার দুটি দিক— একটি প্রবৃত্তির দুর্ভেদ্য আবরণে নিজেকে লুকিয়ে রাখা। অপরটি নিবৃত্তির কুঠারাঘাতে তাঁর আবরণ উন্মোচন করা। যেমন বেলের নরম শাঁস তার কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে। ধনী-গৃহস্থের মূল্যবান রত্ন যেমন তার লৌহ নির্মিত সিন্দুকে সুরক্ষিত থাকে। সুরক্ষিত কঠিন লৌহ কপাট না খুললে যেমন মূল্যবান রত্নের হদিশ পাওয়া যায় না। বেলের শক্ত আবরণকে না ভাঙতে পারলে যেমন সুস্বাদু নরম শাঁসের সন্ধান মেলে না। এও ঠিক তেমনি নিবৃত্তি মূলক ধর্মের কঠোর অনুশীলন ব্যতিরেকে মানুষ তাঁর সেই পরমার্থিক সত্তা, সেই ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করতে পারে না। আমরা সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির মোহজালে বদ্ধ হয়ে আছি। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য এই বন্ধনকেই দৃঢ়তর করছে। প্রবৃত্তিকে না আটকাতে পারলে, কামনা-বাসনাকে চিরতরে দমন না করতে পারলে, ধর্ম-রাজ্যের সেই সিংহ-দুয়ারে পৌঁছনো যাবে না। গীতা সেই পথেরই নির্দেশমূলক গ্রন্থ। গীতার মূল কথা ত্যাগ। কামনা-বাসনা ত্যাগ করে মনের পবিত্রতা অর্জন। যুগাবতার ভগবান রামকৃষ্ণ যথার্থই বলেছেন,— "দশবার গীতা উচ্চারণ করলে, শেষ পর্যন্ত ত্যাগী হয়ে যায়।"

সেই ত্যাগই হলো গীতার মর্ম কথা। বলা বাহুল্য এই ত্যাগ আর পবিত্রতাই হলো ধর্মলাভের একমাত্র উপায়।

(লেখক রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক)

নবাঙ্কুর

শরীরের মাল-মশলা

এখানে একটা বাক্স আছে। বাক্সটা কাঠের তৈরি। শুধু কাঠ? না, তাতে লোহার কব্জা আর তালা। আর চারধারে পিতলের কাজ আছে। আর কী আছে? আর তার গায়ে চকচকে গালা বার্নিশ আছে। সামনে ওই একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কী দিয়ে তৈরি হচ্ছে? ইট, কাঠ, লোহা, চুন, সুরকি, বালি, সিমেন্ট, রং, তেল এইরকম সব জিনিস। এই সমস্ত হলো তার মালমশলা। যারা বাড়ি বানায় তারা হিসেব করে বলতে পারবে, এতে অমুক জিনিস এতখানি আন্দাজ লেগেছে— তার বাজার দাম এত। আচ্ছা— সামনে একটা মানুষ বসে আছে— বলো তো কীসের তৈরি মানুষ? কীসের তৈরি, তার একটু নমুনা শুনবে?

দু'মণ ওজনের একটি মানুষের শরীরের মধ্যে হিসেব করলে একমণ জল পাওয়া যাবে— বেশ বড়-বড় তিন-চার কলসি জল। তার শরীরে যতরকম গ্যাস, বাষ্প বা বাতাস আছে তা যদি আলগা করে বের করতে চাও, তাহলে এত গ্যাস বেরোতে পারে যে তার জন্য ১২ হাত লম্বা, ১২ হাত চওড়া, ৮ হাত উঁচু একটা ঘর লাগবে। তার মধ্যে এমন অনেকখানি গ্যাস পাবে বাজারে যার দাম আছে— বিক্রি করতে পারলে প্রায় টাকা দশেক পাওয়া যায়।

ওই ওজনের একজন সাধারণ মানুষের গায়ে যত চর্বি আছে তা দিয়ে এক পোয়া ওজনের প্রায় গোটা ত্রিশেক মোমবাতি তৈরি হতে পারে। তাছাড়া খাঁটি অঙ্গার বা মূল-কয়লা এত পাওয়া যাবে যে তা দিয়ে দশ হাজার পেনসিলের শিষ তৈরি হতে পারে। বারো সের পাথুরে কয়লার মধ্যেও অতখানি অঙ্গার থাকে না।

খোঁজ করলে একটা শরীরের মধ্য থেকে প্রায় কুড়ি চামচ নুন আর দু-তিন মুঠো চিনি অনায়াসেই বের করা যেতে পারে। যে সমস্ত জিনিস না হলে শরীর টিকতে পারে না তার একটি হচ্ছে লোহা। এই যে রক্তের রং দেখছ, টকটকে লাল, শরীরে লোহা কম পড়লেই সে রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, কঠিন ব্যারাম দেখা দেয়। তখন মানুষকে লোহা মেশানো ওষুধ খাওয়াতে হয়। শরীরে যে লোহার মশলা থাকে, ইচ্ছে করলে তা থেকে লোহা ধাতু বের করে খাঁটি শক্ত লোহা বানানো যায়। একজন সুস্থ মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ লোহা বেরোয় তা দিয়ে এরকম মোটা একটি পেরেক তৈরি হতে পারে যে, একটা মানুষকে অনায়াসে সেই পেরেক থেকে টাঙিয়ে রাখা যায়।

মানুষের শরীরে যে হাড় থাকে তা থেকে দুটি জিনিস খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়— চুন আর ফসফরাস। চুন দিয়ে কত কাজ হয়, তা সকলেই জানো। ফসফরাস দিয়ে দেশলাইয়ের জ্বালানি মশলা তৈরি হয়, আর ইঁদুর মারবার সাংঘাতিক বিষ তৈরি হয়। অনেক ওষুধেও ফসফরাসের ভাগ থাকে। হাড় পুড়িয়ে জমির সঙ্গে মেশালে যে চমৎকার সার হয় সে-ও ওই ফসফরাসের গুণে। একটি মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ খাঁটি ফসফরাস বের করা যায় তা খাওয়ালে অন্তত পাঁচশো মানুষ মারা পড়বে। দেশলাই বানালে তাতে প্রায় আট লক্ষ দেশলাইয়ের মশলা হবে।

সুকুমার রায়

রাজ্য পরিচিতি

পণ্ডিচেরী

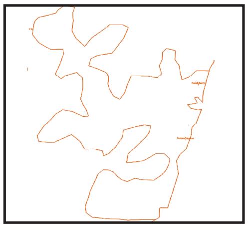

বঙ্গোপসাগরে করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পণ্ডিচেরী। চেন্নাই থেকে ১৬২ কিলোমিটার দূরে। ১৬৭০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত ফরাসি উপনিবেশ ছিল। প্রায় তিনশো বছর ফরাসিরা পণ্ডিচেরী শাসন করে। ২০০৬ সালের পর থেকে পণ্ডিচেরীকে পুদুচেরী নামে অভিহিত করা হয়। আয়তন ৪৯৬ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৬৪ জন। সরকারি ভাষা তামিল ও ইংরেজি। প্রধান ফসল ধান, ডাল, নারিকেল, সুপারি ও মসলা। প্রধান নদী মাহে ও গৌতমী। সমুদ্রতট ও বাস্তুশাস্ত্রে সমৃদ্ধ পণ্ডিচেরী। ঋষি অরবিন্দের সাধনভূমি পণ্ডিচেরী। সারা বছর দেশ বিদেশের পর্যটকরা এখানে ভিড় জমান।

এসো সংস্কৃত শিখি

किम्, गोपालः अस्ति ?

গোপাল আছে কি?

किमर्थम्, एवं जातम् ?

কেন এরকম হলো?

किम्, तत्र एव आसीत् ?

সেইখানেই ছিলেন কি?

किम्, किमपि उक्तवानम् ?

কিছু বললেন কি?

कुतः आनीतवान् ?

কোত্থেকে আনলেন?

ভালো কথা

আমার জন্মদিন

৮ ফেব্রুয়ারি সকালে শাখা শেষ হওয়ার পর আমি দাদাদের প্রণাম করলাম। দাদারা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললাম— আজ আমার জন্মদিন। প্রণবদা ও শুভদা সন্ধ্যায় ২৬নং-এ আসতে বললেন। সেই মতো সন্ধ্যায় ২৬নং এলাম। অর্ঘ্য, অর্জুন, মৌনব হৈহৈ করে এল। সুকেশদা, হিমাংশুদা, যুগলদা, পঙ্কজদা এলেন। আমাকে ওরা একটা আসনে বসালেন। জলচৌকির ওপর একটা বড় মাটির প্রদীপ, সেটার চারপাশে আরও ১২টি ছোট প্রদীপ প্রণবদা রাখলো। অর্ঘ্য আমার কপালে চন্দনের টিপ দিল। আমি বড় প্রদীপটি জ্বালালাম। পরে সবাই একটা একটা করে ১২টা জ্বালালো। আমি তেরোয় পড়লাম, তাই ১৩টা প্রদীপ জ্বালানো হলো। প্রণবদা 'দীপজ্যোতিপরম্ ব্রহ্ম' মন্ত্র বললেন। তারপর সবাই এক এক করে আমাকে পায়েস খাইয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। যুগলদা 'তুমি নির্মল কর' গান গাইলেন। এভাবে জন্মদিন পালন করা আমার খুব ভালো লাগলো। বাড়িতে গিয়ে মাকে বলায় মা-ও খুব খুশি হলেন।

তপোজ্যোতি দাস, সপ্তম শ্রেণী, তারকপ্রামাণিক রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

মামার বাড়ি

পিয়ালী সরকার, তৃতীয় শ্রেণী, ঝিটকিয়া, উঃ দিনাজপুর

ধীরে ধীরে চলছে গাড়ি
যাচ্ছি আমি মামাবাড়ি।
মামার বাড়ি সাহাপুর
যেতে হবে অনেক দূর।

মামাবাড়ি ভারী মজা
দিদা দেবে লুচিভাজা।
দাদু দেবে নতুন কাপড়
যাবো আবার পরের বছর।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

আধুনিক যুগের নারীর ক্ষমতায়ণের পথিকৃৎ

ভগিনী নিবেদিতা

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

প্রখর বাস্তববাদী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তৎকালীন গোঁড়া, রক্ষণশীল সমাজে মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা অবদমিত করার যে প্রবণতা ছিল, সে সম্বন্ধে খুব ভালমতো ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। সেজন্য মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনোই আশা করেননি যে, ওই যুগের হিন্দু রমণীদের লেখাপড়া শিখিয়ে তিনি রাতারাতি তাঁদের স্বনির্ভর করে তুলবেন। তাঁর বিদ্যালয়ে তিনি বালিকা এবং বয়স্কা উভয়পক্ষের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা রেখেছিলেন।

তিনি চেয়েছিলেন যে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন হস্তশিল্পেও নিপুণতা অর্জন করেন। এর ফলে তাঁদের মধ্যে শিল্পের প্রতি ভালবাসা যেমন জন্মাবে, তেমনি তাঁদের অর্থোপার্জনের রাস্তাও খুলে যাবে। কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকার কথা তিনি তাঁর 'নারী ও শিল্প' রচনায় তুলে ধরেছেন। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের পক্ষে সূচীশিল্প অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল— সেজন্য তাঁর রচনায় সূচীশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। সূচীশিল্পকে তিনি জাতীয়তাবাদে সিঞ্চিত করেছিলেন। নিবেদিতা বলেছিলেন, "অতীতে যে শক্তি সঞ্চিত আছে তারই দ্বারা নতুন প্রয়োগক্ষেত্র খুঁজে নিতে হবে। ...প্রাচীন কারুশিল্পগুলি একদা আমাদের মধ্যে যে ধরনের কারিগরি-নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতার শিক্ষা দান করেছিল— তারই সাহায্যে নতুন শিল্প সৃষ্টি করতে হবে।"

সূচীশিল্পের ব্যাপক ব্যবহারিক প্রয়োজনের সমর্থক ছিলেন তিনি। এর জন্য প্রয়োজন ছিল শিক্ষা ও দূরদৃষ্টির। সেজন্য উন্মুক্ত মন নিয়ে লিখেছেন, "যদি বিরাট কোনো সূচী-শিক্ষালয় সৃষ্টি করতে হয় তাহলে ইতিমধ্যে ভারতের শত-শত কারুশিল্পী-সম্প্রদায়ের মধ্যে চোখ ও হাত ব্যবহারের যে-জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে আছে— যা কিছুটা আছে প্রতিটি অন্তঃপুরের হিন্দুনারীর মধ্যেও— তার সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে বুদ্ধিশক্তির উদ্দীপনা। এই বুদ্ধিশক্তি সরবরাহের চিন্তা কি আদৌ করেছে কেউ? কেউ কি ভেবেছে, এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই ইতিহাসের শিক্ষা এবং ভূগোলের জ্ঞান?"

নিবেদিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ভারতীয় নারীরা যেন, "সুন্দরতম অথচ অবহেলিত এই

শিল্পটির মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে ভরিয়ে দেন কল্পনার ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে।" তিনি প্রশ্ন করলেন, হিন্দু মহিলারা কেন যৌথভাবে দুর্গাপূজার জন্য ধ্বজ-পতাকা নির্মাণ করবেন না? বৈষ্ণব সংকীর্তনের পতাকার ক্ষেত্রেও তাঁর এই একই প্রশ্ন ছিল। নিবেদিতা দেখেছিলেন যে, এদেশে হিন্দুনারীরা স্বামীদের জন্য সূচী বা পশমের পাদুকা তৈরি করতেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁরা যেন সেইরকম নৈপুণ্য এবং ভালবাসা দিয়ে দামি বইয়ের মলাট, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি নতুন নতুন বৈচিত্র্যময় জিনিসে তাঁদের সূচীশিল্পের নিপুণতার প্রদর্শন করেন।

ভারতীয় শিল্পের একান্ত অনুরাগিনী নিবেদিতা লিখেছেন— যদি উত্তম নমুনা সামনে রাখতে হয় তাহলে বেনারস বা রাজপুতানা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা ভালো। ...কিন্তু কদাপি 'জার্মানিতে প্রস্তুত বিকট দ্রব্যের অনুকরণ নয়।"

নিবেদিতার অসীম আগ্রহ ছিল সূচীশিল্প সম্বন্ধে। শ্রীমা সারদাদেবীর বাসস্থানে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সূচীশিল্পাদির ওপর 'চমৎকার ছোট্ট প্রদর্শনীর' আয়োজন করেন। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, "ক্রিস্টিন আমার স্বপ্ন পূরণ করেছে— সে আমাকে সূচীশিল্পের ক্লাস নিতে দিচ্ছে— আর তাতে কী যে সুখ পাচ্ছি কী বলব! কিন্তু আমার চাই আইডিয়া— বিশেষত রঙ সম্বন্ধে।" আর একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, "আমি অবিরাম লেখার কাজ করছি, সেই সঙ্গে শিক্ষকদের তৈরি করতে চেষ্টা করছি এবং সূচীশিল্পের ডিজাইন প্রস্তুত করছি। শেষের কাজটি আমি বিশেষ ভালবাসি।

ভারতীয় ডিজাইন সম্বন্ধে নিবেদিতা খুবই উৎসাহী ছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, "ভারতীয় নারীদের তৈরি করা ডিজাইনের উৎস সন্ধান এখনো করা হয়নি। ওদের ডিজাইন অপূর্ব বিস্ময়ের বস্তু। ভারত নানা ধরনের প্যাটার্নে ভর্তি— এখনো সেগুলি কী যে সুন্দর!" একবার মিসেস বুল তাঁকে রাশিয়ান সূচীশিল্প সম্বন্ধে চমৎকার একটি চিঠি লেখেন, 'ভারতীয় নারীদের মধ্যে যে-ধরনের ডিজাইন চলিত আছে তাদের গভীর অনুশীলন করছি। দারুণ একটি বিষয়।'

সূচীশিল্পের মতো একান্ত ঘরোয়া একটি শিল্পকর্মের মধ্যে নিবেদিতা তৎকালীন নারীদের উপার্জনের স্রোত দেখেছিলেন। তিনি এই শিল্পটিকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে তার মধ্যে বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তার প্রচার চেয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য এটি একটি আবশ্যক বিষয় ছিল। সূচীশিল্পে ইতিহাস, ভূগোলের সঙ্গে বুদ্ধিশক্তির সার্থক প্রয়োগের কথা তাঁর আগে এমন করে কেউ ভেবেছিলেন বলে জানা নেই। এই শিল্পের প্রচার প্রসারে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে অনেক প্রচেষ্টাও করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার কিছু নমুনা এখনও নিবেদিতা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন। নিবেদিতার নিজের হাতে তৈরি এবং তাঁর ছাত্রীদের হাতে তৈরি সূচীশিল্পের দৃষ্টান্ত আজও বর্তমান। ■

একেবারে স্বচ্ছ পরিকল্পনা ঋদ্ধ এই বাজেট

অতিথি কলম

চেতন ভগত

প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত গতিতে এগিয়ে চলা কোনো অর্থনীতিতে সেই অর্থে বাজেটের আলাদা কোনো গুরুত্ব নেই। অবশ্যই সরকারের বার্ষিক সামগ্রিক খরচা এবং সেই খরচা জোটাতে যে কর আদায় ও তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে করের হার নাগরিকদের ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো উদ্যোগগুলির ওপর আরোপ করা হবে তার আগাম ঘোষণা বাজেটে থাকেই। আর এই কর কাঠামোয় হেরফেরের একটি বড় প্রভাব নিশ্চিতভাবেই অর্থনীতির ওপর পড়ে। কিন্তু এই বাৎসরিক ব্যবস্থা চালু রাখতে গিয়ে প্রত্যেক বছরই এমন কিছু বড় মাপের পরিবর্তন সাধিত করা উচিত নয় যাতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গতিতে বা শিল্পক্ষেত্রের ভারসাম্যে হঠাৎ এসে ধাক্কা লাগে।

একথা জোর দিয়ে বলা যায়, এই ২০১৭ সালের বাজেট এই সমস্ত ওলট পালট করে দেওয়ার মতো কোনো পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তকে সযত্নে পরিহার করেছে। শেষ অবধি আমরা এবারে যে বাজেটটা পেলাম তা একেবারেই বড় পটভূমির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ। জি এস টি-র অতি শীঘ্র লাগু হওয়া ধরে নিয়ে অর্থমন্ত্রী উৎপাদন শুল্ক, আমদানি শুল্ক ইত্যাকার কয়েক ডজন অপ্রত্যক্ষ করগুলির হারে প্রতি বছরের নিয়ম ভেঙে এবার কিন্তু ছুঁয়েও দেখেননি।

এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় বরাবর সংবাদমাধ্যমগুলির সান্ধ্যকালীন আলোচনা চক্রে শিল্প সংক্রান্ত বিশারদরা চুলচেরা বিশ্লেষণে লেগে পড়তেন। তাঁদের বিচার্য কতটুকু নতুন পাওনার বিনিময়ে কতটুকু দিতে হচ্ছে। কিন্তু এই দিক দিয়ে বিচার করলে এবার অর্থমন্ত্রীকে একাধারে দানী বিদেশি 'সান্টা ক্লজের' ভূমিকায় বা দেশি কড়া 'হেডমাস্টারের' ভূমিকায় কোনোটাতেই নামতে হয়নি। এবারে অন্তত বাজেটে দেশে কাজ কারবার ঠিক যে পদ্ধতিতে ঘটে চলে তার গোড়া ধরে টান মারার কোনো চেষ্টা হয়নি। কেননা কর ও মাশুল উভয়ই নিয়ম করে বাৎসরিক পরিবর্তনের কোপে পড়েনি। শিল্পোদ্যোগী ব্যবসায়ীরা সরকারের শিল্পসংক্রান্ত মনোভাবের ইতিবাচক দিকটি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল। তাই বলা যেতে পারে এবারের বাজেটের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো কিছুই নতুন করে অর্জন না করা। অর্থনীতির অঙ্গ শিল্পক্ষেত্রগুলিতে এখানে ওখানে জোড়াতালি দিয়ে কোনো কিছু করার চেষ্টা বা অপচেষ্টা কোনোটাই করা হয়নি।

এবারে আর এখানে ওখানে মেরামতি বা তাপ্পি দিয়ে চালানো নয়— একেবারে স্বচ্ছ পরিকল্পনা ঋদ্ধ এই বাজেট। এই বাজেট দেখে এমন বলা যায়— অবশেষে ভারত একটি ক্রমবর্ধমান, পরিণত ও সুস্থিত অর্থনীতি হওয়ার পথে অগ্রসরমান।

তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এত কথা বলার দরকার কী? বাজেট আদতে কোন লক্ষ্য নির্দিষ্ট করল? এর নানান লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে বিশেষ করে তিনটির দিকে আলাদাভাবে নজর দেওয়া দরকার— (১) সরকার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আনতে বদ্ধপরিকর। কেননা সরকারের চেয়ে বেশি কেউ ভাল বুঝছে না যে এর ফলে চাকরি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির বৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হবে। আর প্রচুর প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ছাড়া চাকরিতে বড় ধরনের জোয়ার আসবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এফ ডি আই-এর মালিকদের পাল্টা চাহিদাটা ভয়ঙ্কর বেশি। তারা চাইছে দেশে নির্দিষ্ট নীতি, আকর্ষণীয় কর হার, রাজনৈতিক অস্থিরতা ন্যূনতম, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা-মূলকভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ এবং সর্বোপরি লাল ফিতের ফাঁস যেন আটকে না দেয়। তারা পরিষ্কার জানাচ্ছে— এগুলি না পেলে তারা 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনোখানে'। দেশে বিদেশি বিনিয়োগ দেখভাল করার উদ্দেশ্যে আগেকার এফ আই পি বি সংস্থাটির বিলুপ্তি এই লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। কেননা এটিই লাল ফিতের ফাঁসের একটি মূল ফাঁস। এটি বাতিল হওয়ার অর্থ বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নির্দিষ্ট বার্তা পাবে যে ভারতের সদিচ্ছা রয়েছে।

(২) ৫০ কোটি টাকার কম পরিমাণ বিক্রির ক্ষেত্রে কর হার কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। SME (Small Medium Enterprise) ক্ষেত্রটি এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এই ক্ষেত্রটিকেই এখন অর্থনীতির ছোটমাপের চালিকাশক্তি বলে ধরা হচ্ছে। আবার দুঃখের কথা এই ক্ষেত্রটিতেই কর ফাঁকিবাজদেরও দাপট বেশি। অর্থমন্ত্রী আশা করছেন এই ছাড় দেওয়ার ফলে এসএমই-গুলি আরও বেশি করে কর দিতে ইচ্ছুক হবে এবং একই সঙ্গে হার কমার ফলে তাদের ব্যবসাপত্তরে বৃদ্ধি ঘটে লাভও বাড়বে। এই প্রস্তাব নিশ্চয়

সাধুবাদযোগ্য কিন্তু কর্পোরেট হাউসের ক্ষেত্রে কর হারে কোনোই ছাড় না দেওয়াটা খুব ভাল চিন্তা এমনটা বলা যায় না।

সত্যি কথা বলতে হলে গতবারের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী জেটলি বলেছিলেন, আমাদের দেশের কর্পোরেট কর হারকে Asia-Pacific অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে। তবেই নতুন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আমাদের দিকে আকর্ষিত হবে। তাঁর নিজ প্রতিশ্রুতিটি যুক্তিসঙ্গত ও সেই সুবাদে কর্পোরেট করে কিছু কর ছাড় প্রত্যাশিত ছিল। বড় শিল্পোদ্যোগীদের এড়িয়ে গেলে বা তাদের বেশি মাত্রায় কর দিতে হলে— (১) বাইরের বড় শিল্পপতিরা ভারতে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে। (২) অন্যদিকে এসএমই সেক্টরে যারা টার্নওভার ৫০ কোটির নিচে হলে করে বাড়তি ছাড় পাবার যোগ্য হয়েছে তারা হয়তো কর যাতে না দিতে হয় তাই যেনতেনপ্রকারেণ বিক্রির পরিমাণ ওই নির্ধারিত ৫০ কোটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবে। সরকারকে কিন্তু এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করার কথা ভাবতে হবে। (৩) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলিকে টাকা জোগানোর ক্ষেত্রে।

প্রথমত, এক ধাক্কায় পরিচয় গোপন থাকা চাঁদার পরিমাণ ২০ হাজার থেকে নামিয়ে ২ হাজার টাকা করা। দ্বিতীয়ত, পলিটিক্যাল ডোনেশান বোর্ড তৈরি করে দাতার পরিচয় গোপন রেখেও সাদা টাকায় লেনদেন করা যাবে। এ দু'টিই অত্যন্ত সাহসী ও বড় পদক্ষেপ।

এই পন্থাগুলি কালোটাকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী ভূমিকা নেবে সেটি ভবিষ্যৎ বলবে। আমাদের দেশে নোট বাতিলের সময় নিঃস্ব 'জনধন' অ্যাকাউন্টগুলির রাতারাতি রাজা উজির বনে যাওয়ার নোংরা কৌশল তো আমরা দেখেইছি। কিন্তু তবুও এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা অতীতে কেউ কখনও ভাবেইনি। এটি যুগান্তকারী।

একথা হলফ করে বলা যায় যে কয়েক প্রজন্মের স্মৃতির মধ্যেও একটি ক্ষমতাসীন সরকারকে অতি সহজে নিজের দলে শ্রীবৃদ্ধির জন্য বাজার থেকে চাঁদা তোলার নিশ্চিত সুযোগকে হেলাফেলা করে চাঁদায় রাশ পরিয়ে নিজেই নিজের হাত বেঁধে ফেলার এমন উদাহরণ কেউ মনে করতে পারবে না।

> **২০১৭ সালের বাজেট সেই বিরল দৃষ্ট বাজেটের মধ্যে একটি যেটি বুনিয়াদী নিয়মগুলি সফলভাবে মেনেছে।**

হ্যাঁ, অবশ্যই ২ হাজার টাকার ক্ষেত্রে নাম না থাকা আবশ্যিক না হওয়ায় জনৈক 'রামলাল' ১০০টি ২০০০ টাকার নামহীন কুপন নিতেই পারে। কিন্তু যে সংস্কার প্রক্রিয়া গৃহীত হয়েছে তার অভিমুখ তো জোচ্চুরির সব সম্ভাবনা ঠেকাতে পারবে না। তাই ভুল একথা বলা যেতে পারে না। এক্ষেত্রে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করতে গেলে আমাদের আরও অনেক কিছুই করতে হবে। কিন্তু যে চেষ্টাটুকু করা হয়েছে সেটা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকার থেকে তো অনেক ভালো।

বাজেট অন্য চিরাচরিত দিকগুলিকে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে, গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলিতে ও নানা ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিতে উল্লেখযোগ্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আবারও বলছি এবারের বাজেট এদিক ওদিকে ইতস্তত দ্বিধাগ্রস্ত ঘোরাফেরা না করে একটি নীতিভিত্তিক নির্দিষ্ট অভিষ্টে সুপরিকল্পিত ভাবে এগিয়েছে। চিরকালীন সংজ্ঞা অনুযায়ী সেই বাজেটটি হবে সেরা বাজেট যার মধ্যে থাকবে— (১) বেশ কিছু সদর্থক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রকাশ, (২) খুবই কম ক্ষতিকারক অনভিপ্রেত চমক, (৩) যে বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় শিল্পক্ষেত্র হঠাৎ টালমাটাল হয়ে পড়বে না, সে তার নিজের গতিতে এগিয়ে চলবে। এই নিরিখে ২০১৭ সালের বাজেট সেই বিরল দৃষ্ট বাজেটের মধ্যে একটি যেটি এই বুনিয়াদী নিয়মগুলি সফলভাবে মেনেছে। এবারে আর এখানে ওখানে মেরামতি বা তাপ্পি দিয়ে চালানো নয়— একেবারে স্বচ্ছ পরিকল্পনা ঋদ্ধ এই বাজেট।

এই বাজেট দেখে এমন বলা যায়— অবশেষে ভারত একটি ক্রমবর্ধমান, পরিণত ও সুস্থিত অর্থনীতি হওয়ার পথে অগ্রসরমান। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

স্বার্থসিদ্ধি ও প্রগতিশীল সাজার জন্য ইতিহাস বিকৃতি এক জঘন্য অপরাধ

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

গত ৫ ডিসেম্বর একটা বড় পত্রিকায় জনৈক ডাঃ এস এ রায়ের ‘ভারত আজ কলুষিত’ নামে একটা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এতে ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অপরিসীম অজ্ঞতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকট হয়ে উঠেছে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মানসিকতা। আজ দরকার অখণ্ড ভারত-বোধ ও এক নাগরিকত্বের পবিত্র মন্ত্র। কিন্তু এই ধরনের লেখা একটা বিকৃত মনোভাব ও ক্লেদাক্ত ভেদবুদ্ধিকেই উস্কে দেয়।

তাঁর অভিযোগ হলো—

* বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে; * গোরুর মাংস খাওয়ার অপরাধে বহু মুসলমানকে খুন করা হয়েছে; * রাস্তাঘাটে তাঁদের হেনস্থা করা হয়েছে; * চাকরিতে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে; * দাঙ্গা লাগিয়ে মাঝে মাঝে তাঁদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে; * তাঁদের সমাজবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করার দরকার আছে।

প্রথমত, অযোধ্যায় বাব্‌রি মসজিদ আদৌ ভাঙা হয়নি। রামমন্দিরের ওপরের অংশ ভেঙে মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছিল— সেটাই ভাঙা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাসের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন, বাবর অযোধ্যা বিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্রের বাসভূমি অযোধ্যার মন্দির ধ্বংস করেন এবং তার উপর মসজিদ নির্মাণ করেন’— (ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯)। অনুরূপভাবে ড. কে এস লাল মন্তব্য করেছেন, In 1528-29 Mr. Baqri a Maghal commandar, by Babar's order, destroyed the temple at Ayodhya commemorating Lord Rama's birth-place and built a mosque...'—(মুসলিম স্টেট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৫৬)। এই মন্দির পুনরুদ্ধার করার জন্য হিন্দুরা অন্তত ৭৭ বার যুদ্ধ করেছেন বলে ক্রিস্টোফার জেফ্রিলটের বই ‘দ্য হিন্দু ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট’ (পৃ. ৪৭) থেকে জানা গেছে। নিচের অংশ ভাঙা যায়নি— তাই শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, হনুমান ইত্যাদির মূর্তি নাকি এখনও আছে। আর, তাছাড়া— এখানে কিন্তু কোনোদিনই নমাজ পড়া হয়নি।

বলা বাহুল্য, মুসলমান যুগে শত শত মন্দির ভাঙা হয়েছে। হজরতবালের ঘটনার পরেও এটা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মসজিদ ভাঙা হয়নি। বহু রাজপথের ধারের মসজিদকে রক্ষার জন্য রাস্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে— কিন্তু ভেঙে দেওয়া হয়েছে মন্দির।

দ্বিতীয়ত, গো-মাংস খাওয়ার অপরাধে কোনো মুসলমানকে হত্যা করার খবর আমরা জানি না। তবে কোনো কোনো হিন্দু ‘বুদ্ধিজীবী’ আনুষ্ঠানিক ভাবে গো-মাংস খেয়েছেন, কারণ নাকি এটার পেছনে শাস্ত্রের অনুমোদন আছে। কিন্তু ড. সীতানাথ গোস্বামী দেখিয়েছেন যে, এই

প্রকাশ্যে গো-মাংস খাচ্ছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য ও কবি সুবোধ সরকার। (ফাইল চিত্র)

যুক্তিটা শোচনীয় অজ্ঞতার ফসল— হিন্দুশাস্ত্র বরং এর বিরোধিতা করেছে— (স্বস্তিকা, ৩০.১১.১৫)।

তৃতীয়ত, রাস্তাঘাটে বেছে বেছে এবং বিনা কারণে মুসলমানদের হেনস্থা করা হয় কোথায়? পত্রলেখক রাস্তায় বেরোন কিনা জানি না— কিন্তু আমাদের বেরোতে হয়, আমাদের চোখে এমনটা ধরা পড়েনি কখনও। কয়েকজন মুসলমান সহকর্মীর সঙ্গে আমরা কাজ করেছি— আমরা কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মিশেছি বন্ধুর মতোই।

চতুর্থত, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নাকি তাঁদের উপেক্ষা করা হয়। তাহলে ইতিহাসের পৃষ্ঠা একটু ওলটানো যাক। ব্রিটিশ যুগে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষী তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন— এতে বিদেশের জ্ঞান- বিজ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হবে, আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয় হবে ভারতবাসীর। তার ফলে হিন্দুরা দ্রুত ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই দেশে ইংরেজরা মুঘল-শাসন ধ্বংস করেই সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। সেই কারণে ইংরেজ ও ইংরেজি বিদ্বেষ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের এক সহজাত আবেগ। ড. নিমাইসাধন বসু লিখেছেন, ‘The introduction of secular English education and the replacement of the Persian by the English language naturally hurt their prides. They suffered from a sence of humiliation which caused their indifference, it not antipathy to English education’— (দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, পৃ. ৭২)। অনুরূপভাবে ড. বিপান চন্দ্র, ড. অমলেশ ত্রিপাঠী ও ড. বরুণ দে মন্তব্য করেছেন, ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের এই বিদ্বেষই তাঁদের ভয়ানকভাবে পিছিয়ে দিয়েছে— ‘Consequently modern Western education did not spread among the Muslim intellectuals who remained traditionally backward’— ফ্রীডম স্ট্রাগল, পৃ. ১০৪)। অনেক পরে সৈয়দ আমেদ, বদরুদ্দীন তায়েবজী প্রমুখ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরেজি-শিক্ষাকে তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে—

শিক্ষা-দীক্ষায় হিন্দুও এগিয়ে গেছে বহু দূরে। ফার্সি-উর্দু দিয়ে আধুনিক কালের চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়া যায় না। এখনও হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করে— কিন্তু তার দ্বারা কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় অন্যদের সঙ্গে? অবশ্য এই অশিক্ষা ও দারিদ্র্য জড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে— এটা যেন এক 'ভিসিয়াস সার্কেল'— দারিদ্র্য অসংখ্য মুসলমান পরিবারে উচ্চশিক্ষার পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠেছে— আর শিক্ষার অভাবেই তাঁদের দারিদ্র্যকে প্রকট করে তুলেছে।

পঁয়তিরিশ বছর অধ্যাপনা করেছি কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বোধহয় দুই শতাংশ মুসলমানকেও পাইনি। তাদের অনেকে শতকরা ৩/৪ নম্বর পেয়েছে একটা বিষয়ের কোনো কোনো পত্রে।

সুতরাং চাকরির ক্ষেত্রে ওই সম্প্রদায়ের লোক যে কম, সেটা ধর্মগত বিদ্বেষের ফলে আদৌ নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের পিছিয়ে পড়াটাই তার আসল কারণ। দরকার ছিল তাঁদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার— মেকি প্রগতিশীলদের মগজে এই কথাটা কিন্তু ঢোকেনি।

পঞ্চম অভিযোগটা হলো, মাঝে মাঝে দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলমান নিধন করা হয়। এই কথাটা ইতিহাস, বোধ বা অভিজ্ঞতা প্রসূত কি? বরং বলা চলে অনেক সময় উলটোটাই হয়েছে।

দু-একটা উদাহরণ দিই।

১৯২১ সালে গান্ধীজী ওই সম্প্রদায়কে কাছে টানার জন্য খিলাফতকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় মালাবারের মুসলমানরা (মোপলা) ব্যাপকভাবে হিন্দু হত্যা করেছে, চলেছে লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও ধর্ষণ। খিলাফত নেতারা মোপলাদের কিন্তু অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। গান্ধীজীও ঐক্যের নাম করে চুপ ছিলেন এই ব্যাপারে— (ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য— ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ১৫৫)।

১৯৪৬ সালে জিন্নার 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এ সাড়া দিয়ে ব্যাপক হিন্দু নিধনে নেমেছিল মুসলমান গুণ্ডারা। ড. এস. এন. সেন মন্তব্য করেছেন, 'The Direct Action day was signalized by the great Calcutta killing...' (হিস্ট্রি অব দ্য ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৩২৮)। সেই নারকীয়তা ছড়ানো হয়েছে পূর্ব-বাংলা ও পঞ্জাবেও। কয়েক বছর আগে গোধরায় রেলের কামরা বাইরে থেকে বন্ধ করে করসেবকদের জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে। উক্ত পত্রলেখক একতরফাভাবে হিন্দুদের দায়ী করেছেন। কিন্তু 'Hindu Muslim riots become a common affiair and there may be a riot for anything or nothing'— (ড. হরিহর দাস— ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৪০০)।

ষষ্ঠত, এই সম্প্রদায়ের সবাইকে নাকি অপরাধী ও সন্ত্রাসবাদী বলে ধরে নেওয়া হয়। যে-কোনো ধর্মমতের মানুষ অপরাধ করতে পারে কিন্তু বিশেষ ধর্মের মানুষদের মধ্যে সবাইকে কেউ অপরাধী বলেননি। তবে এটা ঠিক যে, যেসব সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়েছে বা শাস্তি পেয়েছে, তারা সবাই কিন্তু এই ধর্মমতের লোক। এই কারণে তাঁদের অনেককেই সন্দেহ করা হয়েছে। তাজ হোটেল, খাগড়াগড়, উরি, আমেরিকান সেন্টার প্রভৃতি জায়গায় হামলা করেছে কারা? কাসভ, আফজল গুরু, বুরহান-রা ঘাতক কোন সম্প্রদায়ের লোক? এদের সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই সংক্রামক হয়ে উঠেছে এই সন্দেহ ব্যাধি।

পরিশেষে অন্য দু-একটা কথা বলি।

কিছু মুসলমান বন্ধু ও ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি— তারা মুসলমান, ভারতীয় নয়। তাদের অনেকে পাক-ভারত ক্রিকেট খেলার সময় পাকিস্তানকেই সমর্থন করেছে। এই 'আইডেন্টিটি- ক্রাইসিস্‌ই' এই দেশের সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। তাঁরা ভারতের নাগরিক কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা তাঁদের কাছে নেই— তাঁদের চালিত করে শরিয়তি আইন। আমাদের সংবিধানের ৬৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলিত হওয়ার কথা। কিন্তু গত ৬৭ বছরেও সেটা হয়নি— বিবাহ, বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি শরিয়তি ব্যাপার। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক কুলদীপ সিং রায় দিয়েছিলেন— 'no community can oppose the introduction of uniform civil code for all citizens'— (সরলা মুদগল বনাম কেন্দ্র, ১৯১৫)। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের অনেকে এই অনুচ্ছেদকেই বাতিল করতে চেয়েছেন।

সেই সঙ্গে অনেক হিন্দু 'প্রগতিশীল' ও 'সেকুলার' সাজতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। ১৯৪৬ সালে পূর্ব-বাংলা ও পঞ্জাবে ব্যাপক হিন্দু নিধন চলেছে অবাধে কিন্তু বিহারে উলটো হওয়ায় নেহরু বলেছিলেন, সেখানে বোমা ফেলা উচিত। ১৯৫৭ সালে বিধানবাবু বৌবাজার কেন্দ্রে সিপিআই-এর মহম্মদ ইসমাইলের বিরুদ্ধে মাত্র ৫৪০ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। জ্যোতি বসু মন্তব্য করেছিলেন— মুখ্যমন্ত্রী বুঝেছেন যে, তিনি মুসলমান ভোট পাননি— কিন্তু আক্রোশবশত তিনি যেন তাঁদের ওপর অত্যাচার না করেন, কারণ এখানে তাঁরা মরেই আছেন। শতাধিক আইনজীবী তখন খোলা চিঠিতে লিখেছেন— তিনি যেন পাকিস্তানে গিয়ে রাজনীতি করেন। মনমোহন সিংহ একবার বলেছেন, এই দেশের সম্পদে প্রধান দাবি মুসলমানদেরই।

সেই 'ট্রেডিশন' আজও চলছে।

এই কারণে ড. এস এল সিক্রি মন্তব্য করেছেন— হিন্দু-বিদ্বেষীরাই এখন সেকুলার— 'By and large, a Hindu is to-day is accepted as secular only if he is pro-muslim and perhaps, pro-other miornities'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ২৯২)। সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অকালপক্ক বালক-বালিকারা কাশ্মীরের মুক্তির দাবি তোলে, আফজল গুরুকে 'শহিদ' বানায়। এদের কারা ইতিহাস পড়ান জানি না— কিন্তু তাঁরাও কখনও পত্র-পত্রিকায় প্রতিবাদ জানাননি--- তবে কি পাঠ্য-বিষয় বাদ দিয়ে তাঁরা 'প্রগতিশীলতার' শিক্ষা দেন?

কেউ কেউ গো-মাংস প্রকাশ্যে খেয়ে 'আধুনিক' সেজেছেন। খাওয়াটা অবশ্যই ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার, আর গো-মাংস খাওয়াটা কোনো অপরাধই নয়। কিন্তু তার জন্য শাস্ত্রবাক্যের অপব্যাখ্যা করতে হবে কেন? কোন্ হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এটাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সেটা এরা দেখাতে পারবে? তাছাড়া একজন মুসলমান নেতা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন— প্রশ্ন হলো তিনি কি প্রকাশ্যে শূকর-মাংস খেয়েছেন?

মূল কথা হলো, গোঁড়ামিকে বর্জন করতেই হবে— কিন্তু সঙ্গে দরকার যথার্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস-পাঠ ও বাস্তববোধ। আমাদের ঐতিহ্য, ধর্ম, ইতিহাস ও সংবিধান শিখিয়েছে সর্ব ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। স্বার্থসিদ্ধি করা ও প্রগতিশীল সাজার জন্য ইতিহাস বিকৃতি এক জঘন্য অপরাধ।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

বিষয় : অসহিষ্ণুতা বনাম অসহিষ্ণুতা

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

ফাল্গুনের সকাল বেলা। সুমিষ্ট মলয়জ পবন বইছে। বারান্দায় চেয়ার নিয়ে হালকা রোদে বসে ব্রহ্মা বেদ পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। পবিত্র বেদগ্রন্থ বহু পুরনো। লেখাগুলোর কালি অস্পষ্ট। কিছু কিছু জায়গায় পোকা খেয়ে নিয়েছে। বেদগ্রন্থ পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও বিধর্মী গ্রন্থকীটরা গ্রন্থটি কাটতে ইতস্তত করেনি। সেই সঙ্গে আরেকটা ঝামেলা হয়েছে। চশমাটির পাওয়ার বেড়ে যাওয়ার ফলে বেদগ্রন্থ যেটুকু বা পড়া যেত তাও পড়া যাচ্ছে না। কন্যা সরস্বতীকে কত বলেছেন, মা একটু চক্ষু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে চলো। কিন্তু সে খালি বলছে, হ্যাঁ নিয়ে যাব বাবা। তিনি কোনোরকমে বেদ পড়ছিলেন আর গ্রন্থকীট এবং কন্যা সরস্বতীর প্রতি মনে মনে ক্রোধ প্রকাশ করছিলেন। এমন সময় বীণা বাজাতে বাজাতে নারদ 'জয় শ্রীরাম' বলে ব্রহ্মার সামনে হাজির হয়ে সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মার মাথা এমনিতেই গরম ছিল আরও গরম হয়ে গেল। ব্রহ্মার সামনে 'জয় ব্রহ্মা' না বলে অনুপস্থিত 'জয় শ্রীরাম' বললে কার না রাগ হয়? তবু ব্রহ্মা একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। রাগ চেপে বললেন, কিমর্থং আগমনং।

অনেক দিন ভারত ভূমণ্ডল ঘুরে নারদ সংস্কৃত ভুলে গিয়েছিলেন। শিষ্য ও চাটুকারদের সঙ্গে হিন্দিতেই কথা চালাতেন। তিনি অনেকদিন পর এই সংস্কৃত বাক্য শুনে ঘাবড়ে গেলেন। তার উপর ব্রহ্মার গোমড়া মুখ দেখে ভয়ও পেলেন। কিন্তু তিনি বহু ঘাটের জল খাওয়া লোক, কী করে প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলাতে হয় তিনি খুব ভালোই জানেন। তিনি বীণা বাজিয়ে ব্রহ্মার স্তব করতে শুরু করলেন— হে অযোনিসম্ভব, আপনি এই স্থাবর অস্থাবর পৃথিবীর স্রষ্টা, আপনার অঙ্গুলি হেলনে এই সৃষ্টি হয়, সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হয়ে পূর্ব দিকে অস্ত যেতে পারে, সমুদ্র নিম্নমুখী না হয়ে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে, আপনি চাইলে শিব, নারায়ণকে তাদের পদ থেকে অপসারিত করতে পারেন। নারদের মুখে সকাল বেলায় নিজের স্তব শুনে ব্রহ্মা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হলেন, বিশেষত যখন আজকের দিনের আলট্রা মডার্ন ছেলেমেয়েরা তাঁর অস্তিত্বই স্বীকার করে না, পূজা করা তো দূরের কথা। যাই হোক, বুদ্ধিমান লোকের মতো তিনি নারদের প্রশংসায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। খালি মিষ্টি ভাষায় বললেন— বদতু তে সমস্যাং।

নারদ বীণা এক পাশে রেখে বললেন— হে বিশ্বস্রষ্টা, আপনার সৃষ্ট পৃথিবী বুঝি এবার রসাতলে গেল। এতদিন ভারতে অসহিষ্ণুতার কথা শোনা যেত। এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও অসহিষ্ণুতার কথা শোনা যাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প সে দেশের ৪৫ তম রাষ্ট্রপতি হয়েই ঘোষণা করেছেন ইরাক, ইরান, সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া, সুদান ও সোমালিয়া এই সাতটি মুসলমান দেশ থেকে কোনো মুসলমান আমেরিকায় অন্তত ছ'মাস প্রবেশ করতে পারবে না। এতে ওখানকার বাম, উদার ও বহুত্ববাদীরা খেপে প্রতিদিন মিছিল বের করছে, তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করছে। তাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, চলচ্চিত্রশিল্পীরা এককাট্টা হয়ে ট্রাম্প সাহেবের মুণ্ডপাত করছে। বিরোধীদের মূল বক্তব্য হলো— আমেরিকার ইতিহাস অভিবাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রভু, আপনি বলুন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নীতি কী খারাপ, না ভালো?

ব্রহ্মা বললেন, আমিও আমি অনেক দিন পৃথিবীর খবর রাখি না। আমি একটু ধ্যান করে সম্যক জ্ঞাত হই। ব্রহ্মা ধ্যানে বসলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে মুখ বিকৃত করে চক্ষু উন্মীলন করলেন, উঃ কী ছারপোকা! নারদ চোখ বড় বড় করে দেখলেন, ব্রহ্মার আসনে ছারপোকা গিজ গিজ করছে। করুণ চোখে মনে মনে বললেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সোল প্রপাইটার ব্রহ্মাকেও ছারপোকারা কামড়াচ্ছে!

ব্রহ্মা অবশেষে বিরক্ত মুখে বললেন, হ্যাঁ শোনো,

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নীতি ভালো, খুব ভালো। মুসলমানরা মায় পৃথিবীর লোক যারা আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছে, সেখানে করে খাচ্ছে তারা কেউ আমেরিকাকে ভালোবাসে না। আমেরিকাকে ধ্বংস করার জন্য তারা সেখানে দিন রাত চক্রান্ত করছে। বিশেষত মুসলমানরা এই কাজে লিপ্ত। তারা নিজেদের আয়ের বড় অংশ আমেরিকাকে ধ্বংস করার কাজে লাগাচ্ছে। সেই সঙ্গে মুসলমান দেশগুলিও তাদের টাকা জোগান দিচ্ছে। আগের রাষ্ট্রপতিরা এসব নিয়ে ভাবেননি আর সদ্য বিদায়ী রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা এ ব্যাপারে গোপনে গোপনে সহযোগিতা করেছেন।

নারদের প্রশ্ন— তিনি মুসলমান ছিলেন বলে বোধহয়?

সে তো নিশ্চয়ই। এই ভাবে চলতে থাকলে আমেরিকা একদিন মুসলমান রাষ্ট্র হয়ে যেত। আর এই জিনিসটা আমেরিকার আম জনতা মেনে নেয়নি। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প নির্বাচনের আগেই জানিয়েছিলেন তিনি তাঁর দেশ থেকে মুসলমানদের তাড়াবেন। এর ফলে ওদেশের মুসলমানরা যেমন খেপে গিয়েছিল তেমনি বামপন্থীরাও খেপে গিয়েছিল। বামপন্থীরা সব সময়ই মুসলমানদের পক্ষে। আমাদের দেশে মোদীজী জিতে এসে সরকার গঠন করলে যেমন ভুয়ো উদারপন্থী মায় বামপন্থীরা আন্দোলন শুরু করেছিল অসহিষ্ণুতার জিগির তুলে, তেমনি ভুয়ো উদারপন্থী মায় বামপন্থীরা ওখানেও রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে ব্যতিব্যস্ত করছে।

নারদ বললেন, হে জগদীশ্বর, ট্রাম্প সাহেব কেন এদের মানে বামপন্থীদের মুখোশ খুলে দিচ্ছেন না?

এটা তাঁর উচিত ছিল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন নির্বাচনের সময় তাঁর মুসলমান ও অন্যান্য নীতি নিয়ে সমালোচনায় মুখর ছিল, বলছিল রাশিয়ার গোয়েন্দারা তাঁকে নির্বাচন কাজে সাহায্য করেছেন, তিনি কিন্তু উলটে বলেননি যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটন মুসলমান দেশ থেকে ঢালাও অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। বললে বিরোধীদের মুখ চুপসে যেত।

ভারত সম্পর্কে আপনার বক্তব্য দু'এক কথায় বলবেন দেব-পিতা?

ট্রাম্প সম্বন্ধে যে কথা বলা যায় সে কথা মোদীজীর সম্বন্ধেও বলা যায়। তিনি তথাকথিত বামপন্থী ও প্রগতিবাদীদের মুখোশ খুলে দিতে উদ্যোগ নিচ্ছেন না। তাঁদের হিন্দুবিরোধী প্রচারের বেলুন চুপসে দিচ্ছেন না। তাঁর দলের অন্য হিন্দুত্ববিরোধীরা বামপন্থী ও প্রগতিবাদীদের সম্বন্ধে কিছু বললে তিনি চুপ করে থাকছেন। এতে হিন্দুত্ববাদীরা মনের জোর হারাচ্ছে। মুসলমানরা সারা দেশে প্রতিদিন কীরকম ভারত বিরোধী কাজ করছে তার একটা রেকর্ড লোকসভা এবং রাজ্যসভায় এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে বামপন্থী ও প্রগতিবাদীদের মুখ বন্ধ হয়ে যেত। অরডিন্যান্স করে তিন তালাক প্রথা বন্ধ করলে, মাদ্রাসায় ভারত বিরোধী পাঠ্যক্রমে ফরমান জারি করলে, বামপন্থীরা তথা কংগ্রেসিরা কীভাবে ভারত স্বাধীন হওয়া থেকে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে বিদেশের সঙ্গে আপোশ করেছে এসব প্রকাশ করলে মোদীজীকে এমন বিপর্যস্ত হতে হোত না। প্রতি মাসে মুসলমানেরা দেশের কোথাও না কোথাও মন্দির ভাঙছে, হিন্দুদের জমি জোর করে দখল করছে এসব টিভি, রেডিও মারফত জানানো জরুরি ছিল। আর সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল মুসলমানদের সংখ্যালঘু তকমা কেড়ে নেওয়া। দেশের এক চতুর্থাংশ মুসলমানরা সংখ্যালঘু কীসের?

কাশ্মীরের সমস্যা কী বলোতো?

আপনি বলুন প্রভু।

ব্রহ্মা বললেন, বামপন্থী ও প্রগতিবাদীরা তথা বিচ্ছিন্নপন্থীরা বলছে, ওদের চাকরি নেই বলে ওরা কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে। কিন্তু তা নয়। ওদের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে কোনো মুসলমান অ-মুসলমান দেশে থাকবে না। ওদের সমস্যা দারিদ্র্য নয়, ধর্মীয় শিক্ষা। অটলবিহারী সরকার যেমন, তেমনি মোদী সরকার ওদের টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করছে। কাশ্মীরে যেটা আশু দরকার ওখানে ব্যাপক হারে হিন্দুদের বসতি করতে দেওয়া। ওখানে হিন্দুর সংখ্যা বাড়ানো। হিন্দুদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া, যেমন পাকিস্তান মুসলমানদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। অবশ্য এসব গোপনে করতে হবে।

ব্রহ্মা বললেন, মুসলমানেরা কত দেশবিরোধী দেখ। বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্র প্রসাদ সিংহদের দেওয়া জমির উপর আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটি তৈরি হয়েছে অথচ ওঁর জন্মজয়ন্তী ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসে ওরা করতে দেয়নি। ইউনিভারসিটিতে মসজিদ একাধিক আছে অথচ হিন্দু ছেলেরা সরস্বতী বা অন্য দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে পুজো করতে পারবে না। মনে রাখবে, অসহিষ্ণুতাকে আঘাত হানতে হবে সহিষ্ণুতা দিয়ে নয়— অসহিষ্ণুতা দিয়ে। বিষের ওষুধ মধু নয়— বিষ। বিষস্য বিষমৌষধম্। বিরোধীদের প্রতি একটু নরম হলে তারা মাথায় চেপে বসবে। খুব সম্ভব রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আমেরিকা জুড়ে তাঁর প্রতি অসহিষ্ণুতাকে অসহিষ্ণুতা দিয়ে দমন করবেন, যেমন করেছিলেন তার পূর্বসূরী আব্রাহাম লিংকন। ■

মৌলবাদের প্রতিস্পর্ধী

হাসিনা ফারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়তে হয় হাসিনা ফারাজ জানেন। প্রতিক্রিয়াশীল এবং ধর্মান্ধ মৌলবিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহসও তাঁর কম নয়। বস্তুত, মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে মেয়র পদে হাসিনার নির্বাচন এইসব মৌলবিদের গালে বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় বিশেষ। কারণ এরাই মুসলমান সমাজে মেয়েদের সমানাধিকারের বিরোধী। মৌলবিদের দুষ্টচক্র ভেঙে দিয়ে হাসিনা ফারাজ মুসলমান মেয়েদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন।

নিজেদেরই সম্প্রদায়ের এক মহিলাকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য ইসলামি মৌলবাদের চেহারা কতটা কদর্য হতে পারে সেটা একটু দেখা যাক। কোলহাপুরের পুরসভা নির্বাচনে হাসিনা ফারোজ যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারেন তার জন্য কয়েকজন মৌলানা ও মৌলবি এবং তাদের সহচর কিছু অতি রক্ষণশীল মহিলা চেষ্টার কসুর করেননি। তাদের যুক্তি, মেয়েদের রাজনীতি করা কোরান এবং ইসলাম বিরোধী। সম্ভবত তারা পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা জানেন না। অথবা জেনেও নিজেদের স্বার্থে না-জানার ভান করছেন।

হাসিনা ফারাজকে বাগে আনতে না পেরে মৌলবিরা তার বিরুদ্ধে ফতোয়া পর্যন্ত জারি করেছিল। কিন্তু বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে মোট ১৯ জন মহিলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। হাসিনা-সহ বিজয়ী হন ৫ জন। এই ঘটনা প্রমাণ করে মুসলমান মহিলারা আর ধর্মের অন্ধকারে দিন কাটাতে রাজি নন। সেকথা হাসিনাও মানেন। তিনি বলেন,

'এই ধরনের ফতোয়া দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরোধী। কোলহাপুরে ছত্রপতি শাহুজী মহারাজের ঐতিহ্য রয়েছে। আমরা ফতোয়া- টতোয়ায় গুরুত্ব না দিয়ে নির্বাচনে লড়েছি। সমাজ এখন বদলে গেছে। মুসলমান মেয়েরা জীবনের সর্বস্তরে মানিয়ে নিচ্ছে। ভবিষ্যতের যদি আমার নামে ফতোয়া জারি হয় আমি লড়ব।'

তবে হাসিনা ফারাজের আসল লড়াই শুরু হবে এবার। তাঁকে আরও বেশি করে মুসলমান মেয়েদের সমাজজীবনের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। মেয়েরা যাতে সমানাধিকারের জন্য পুরুষের সঙ্গে লড়াই করতে পারে কিংবা সংবিধান-প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পারে তার জন্য হাসিনাকেই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে হবে। একথা অনস্বীকার্য, তিন তালাক এবং হালালের মতো কুপ্রথার কারণে মুসলমান মহিলাদের জীবন খুবই কষ্টের। বদলে যাওয়া পৃথিবীতে কোথায় কী সংস্কার তাঁরা অনেকেই জানেন। এও মানেন যুগলক্ষণকে অস্বীকার করে সময়ের থেকে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়লে একসময় অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে। কিন্তু মুশকিল হলো মুসলমান সমাজ কোনোরকম সংস্কার বা পরিবর্তন বরদাস্ত করে না। কেউ প্রশ্ন করলে অথবা ধর্মতন্ত্রকে অবজ্ঞা করে এগিয়ে গেলে মৌলবিরা তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।

মুসলমান মেয়েদের জীবনের ভয়াবহতার একটি কঠোর ছবি এঁকেছেন লেখক আবদুল বিসমিল্লাহ্, তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস ঝিনি ঝিনি বিনি চুনারিয়াতে। উপন্যাসের একটি মেয়ে চরিত্রের দমচাপা কাতরোক্তি, 'মেয়েদের আর কাজ কী! রান্না করো, বরের সঙ্গে শোও, বাচ্চার জন্ম দাও আর পুরুষমানুষের দাসিবাঁদি হয়ে জীবন কাটিয়ে দাও। না পারলে স্বামীর মুখে শোনো, তালাক...তালাক...তালাক।'

হাসিনা ফারাজের কাজটা তাই মোটেই সহজ নয়। তবে যে ভঙ্গিতে তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন তাতে তার ওপর ভরসা রাখাই যায়। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

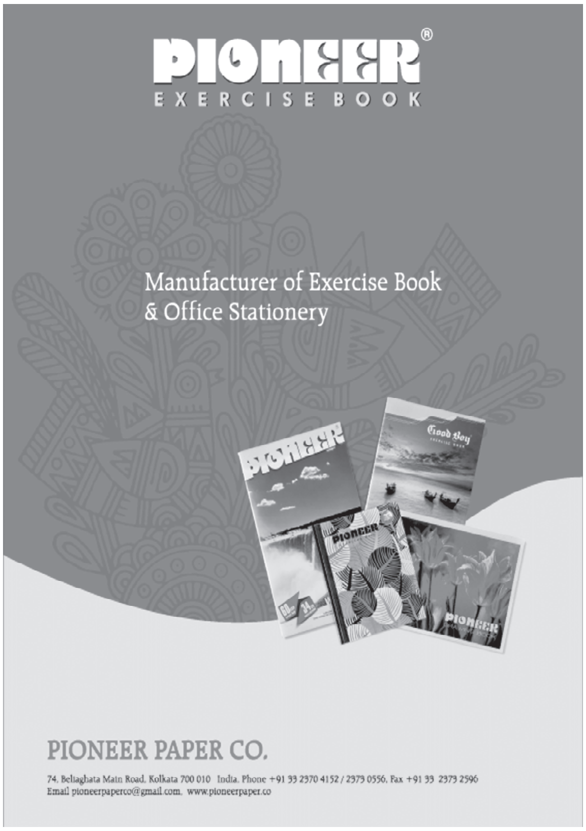

"তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র তাই নয়, অতীত ও ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক— যদি যথার্থই অভিন্ন সত্তা হয়, তবে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি— সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্য উপলব্ধির পন্থা। অতএব আধ্যাত্মিক ও লৌকিক— এই ভেদ আর থাকতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা, জয় করার অর্থ ত্যাগ, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্যে পরিণত। যোগ ও মোক্ষ— ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ক্যানসার ও হোমিও চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ক্যানসার শব্দটি ল্যাটিন 'ক্যানক্রাম' থেকে এসেছে। ক্যানক্রাম শব্দের অর্থ হলো কাঁকড়া। কাঁকড়া যেমন হাত পা চারদিকে বিছিয়ে থাকে ঠিক তেমনি ক্যানসার নামের রোগটি যে জায়গায় শুরু হয় তার চারপাশেই শুধু নয় তার উৎপত্তির জায়গা থেকে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। সেই জন্যই এ রোগটিকে ক্যানসার বলে।

রোগটা কী ধরনের?

আমাদের শরীরটাকে একটা বাড়ির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। বাড়িটার কাঠামোর কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখি যে কতকগুলো ঘরের সমাহার। আবার ঘরগুলো কতকগুলো দেওয়ালের সমষ্টি। কিন্তু এক একটি দেওয়াল তৈরি হয়েছে অনেকগুলো ইটের গাঁথনির মাধ্যমে। এই শরীরটার একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য রয়েছে বাড়ির সঙ্গে। আমাদের শরীরটা তৈরি হয়েছে বেশ কতকগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে। অঙ্গগুলো তৈরি হয়েছে আবার বেশ কিছু দেহকলা নিয়ে। আর দেহকলা তো আসলে অসংখ্য কোষের সমষ্টি। আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখন ওজন থাকে প্রায় পাঁচ পাউন্ড। উচ্চতায় আমরা প্রায় ফুট দেড়েক। কিন্তু যখন পরিণত বয়সে উপনীত হই তখন দেহের ওজন প্রায় ১০০ পাউন্ড। উচ্চতা সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় ফুট। এটা কী করে সম্ভব হলো? সম্ভব হয়েছে দেহের কোষগুলোর বৃদ্ধি ঘটার কারণে। কখনও সেগুলি বাড়ে সংখ্যায়, কখনও আকারে। ফলে নবজাত শিশুর আট দশ ইঞ্চি পা এক সময়ে তিন চার ফুট হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই কোষ বৃদ্ধির উপর শরীরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। শরীরের স্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধির উপর যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকত তাহলে আমরা দানবের চাইতেও বড় হয়ে যেতাম। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। আসলে শরীরের কোষগুলো যখন নিয়ন্ত্রণ বিহীনভাবে বাড়তে থাকে এবং শরীরের কোনো কাজে আসে না, সেই কোষগুলোর সমষ্টিকে আমরা বলি টিউমার। টিউমারের ভিতরের কোষগুলোর চেহারা কখনও স্বাভাবিক

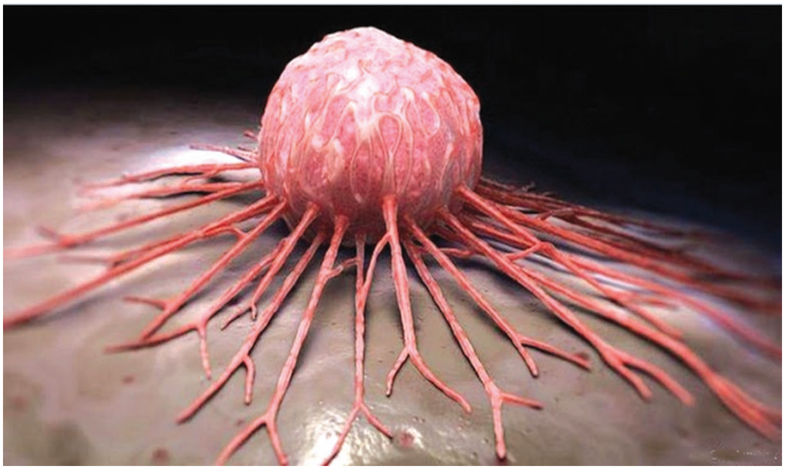

কোষগুলোর মতোই হতে পারে এবং চরিত্রের দিক থেকেও এই কোষগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকারক নাও হতে পারে। এ ধরনের কোষ সমষ্টিকে আমরা বলি বিনাইন টিউমার। আর যখন ওই টিউমার কোষগুলোর চেহারা শরীরের কোষগুলো থেকে ভিন্ন ধরনের হয় এবং কাজের দিক থেকেও অস্বাভাবিক ও শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হয় তখন আমরা তাকে বলি মেলিগন্যান্ট টিউমার যার সধারণ নাম ক্যানসার।

ক্যানসার কেন হয়?

শতকরা ৯০ ভাগ ক্যানসারের জন্য দায়ী আমাদের পরিবেশ আর আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা পদ্ধতি। আজ একথা প্রমাণিত যে দেহের সমস্ত ক্যানসারের প্রায় ত্রিশ ভাগের জন্যই দায়ী তামাক কিংবা ধূমপান। মদ্যপানের সঙ্গে মুখের ক্যানসার, গলবিলের ক্যানসার জড়িত। তাছাড়া মদ্যপানের ফলে এক সময় লিভারের ক্যান্সারও হতে পারে। আজকাল কেউ কেউ মনে করেন অল্পসল্প মদ্যপানে তো কোনো ক্ষতি নেই। গবেষণার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে অল্পই হোক আর বেশিই হোক মদ্যপান শরীরের কোনো না কোনো ক্ষতি করবেই। আর এক নেশার নাম পান। পানের সঙ্গে চুন মেশানো হয়। অনেক সময় সুগন্ধি জর্দাও। এই চুন ও জর্দার সংমিশ্রণে পান পাতা চিবানোর ফলে মুখে এক ধরনের ক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। সেই ঘা সহজে সারতে চায় না। এই ভাবে কণ্ঠনালীর ক্যানসার আত্মপ্রকাশ করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, স্রেফ পান খেয়ে ভারতে ৩৫ শতাংশ মানুষ নানান ক্যানসারে আক্রান্ত হন। এছাড়াও মুখের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, দাঁত অকালে পড়ে যায়। পানের সঙ্গে থাকে আর একটি জিনিস সেটি হলো সুপারি। এতে রয়েছে 'অ্যারাকোলিন' নামে একটি উপাদান। এটিও কোষের ক্ষতি করে। সুপারিতে থাকা ট্যানিক অ্যাসিড কোষের মধ্যস্থ জিনকে প্রভাবিত করে। ফলে শারীরিক বিকৃতি ও জটিল রোগ দেখা দেয়। বেশির ভাগ সুপারি আবার 'অ্যাফালটপ্রিন' নামে এক জাতীয় ছত্রাক আক্রান্ত। এ ধরনের সুপারি লিভারের ক্যানসারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। বাজারে বিক্রিত অধিকাংশ মিষ্টি সুপারি এই বিষাক্ত ছত্রাকে আক্রান্ত বলে বিজ্ঞানীরা

জানিয়েছেন। পানে দেওয়া খয়ের, খয়েরের প্রধান উপাদান ট্যানিন থেকে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। মহিলাদের ক্ষেত্রে জরায়ু মুখের ক্যানসার আর স্তনের ক্যানসার বেশি দেখা যায়। জরায়ু মুখের ক্যানসারের জন্য খুব কম বয়সে বিয়ে, অনেক সন্তান প্রসব, যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা না করা আর একাধিক পুরুষের সঙ্গে মিলনই দায়ী। আর স্তনের ক্যানসারের একটি কারণ শিশুকে বুকের দুধ না খাওয়ানো। প্রাণীজ আমিষ ও প্রাণীজ তেল জাতীয় খাদ্য বেশি গ্রহণ এবং পাশাপাশি শারীরিক পরিশ্রম না করাই অনেকাংশে দায়ী। লিভারের ক্যানসারের জন্য মদ্যপান তো বটেই তার সঙ্গে জন্ডিসের একটি ভাইরাস রেপাটাইটি বি দায়ী। ক্যানসারের মধ্যে ব্লাড ক্যানসার আর একটি জটিল রোগ। ব্লাড ক্যানসারকে চিকিৎসা পরিভাষায় লিউকোমিয়া বলা হয়। মানবদেহে রক্তকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি রক্তরস ও আরেকটি রক্ত কণিকা। রক্ত কণিকা আবার তিন প্রকার। যেমন লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেত রক্ত কণিকা ও অনুচক্রিকা। আমাদের প্রতি সি সি রক্তে ৪০০০- ১১০০০ শ্বেত রক্ত কণিকা থাকে কিন্তু লিউকোমিয়া হলে এই সংখ্যা বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে এ সংখ্যা বেড়ে ৫০,০০০-১,০০,০০০ পর্যন্ত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে কোষগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় কিন্তু লিউকোমিয়ার কোষের সংখ্যা বাড়লে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে। কোষ বাড়ে ঠিকই, কোষগুলি অপরিণত হয় যার জন্য এর কার্যাবলী সঠিকভাবে করতে পারে না। ব্লাড ক্যানসার জীবন ধ্বংসকারী একটি রোগ। এ রোগ যে-কোনো বয়সে যে-কোনো সময় হতে পারে। ব্লাড ক্যানসারের প্রকারভেদ :

লিউকোমিয়ার অনেক রকমভেদ আছে --- একটি একিউট মায়েলয়েড লিউকোমিয়া এটি সাধারণত ৩-৫ বৎসরের ছেলেমেয়েদের বেশি হয় আর একটি নাম লিম্ফোব্লাসটিক লিউকোমিয়া। এটি বড়দের বেশি হয়।

ব্লাড ক্যানসারের সম্ভাব্য কারণ

এ রোগের প্রকৃত কারণ এখনও জানা সম্ভব হয়নি, তবে এ পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণায় যেসব কারণ জানা সম্ভব হয়েছে তা নিম্নরূপ— পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ পরবর্তী আবাহাওয়ার পরিবর্তন (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে দেখা গেছে, গর্ভবতী মায়েদের যদি অতিরিক্ত এক্স-রে করানো হয় তবে গর্ভস্থ সন্তানের ব্লাড ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। বেনজিন কারখানায় শ্রমিকদের ঝুঁকি বেশি। এনকালাইজিং স্পন্ডিলাইটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত রেডিও থেরাপিও ব্লাড ক্যানসার তৈরি করতে পারে। যারা দীর্ঘদিন যাবৎ আয়োনাইজিং বেরিয়ে অর্থাৎ এক্স-রে ইত্যাদি সংস্পর্শে কাজ করে। সাইটোটপ্রিক ওষুধ গ্রহণকারী রোগীদের রেটো ভাইরাস নামক এক ধরনের ভাইরাসও দায়ী বলে জানা গেছে।

ব্লাড ক্যানসারের উপসর্গ

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীর শরীরে সামান্য জ্বর থাকে। ধীরে ধীরে ওজন কমে যাওয়া ও দুর্বলতা বোধ করা, ক্রনিক লিউকোমিয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় যকৃৎ ও প্লীহা বড় হয়ে যায়। আহারের অরুচি। খিটখিটে মেজাজ হওয়া। ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে, দাঁতের গোড়া ও মাড়ি ফুলে যায়। কখনো রক্ত ক্ষরণের সমস্যা হতে পারে। লিম্ফগ্লান্ড ফুলে যায়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথিতে নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ দেওয়া উচিত নয়। তবে হোমিওপ্যাথিতে ক্যানসারের চিকিৎসায় বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজন রোগীর চিকিৎসা করে তাদের যন্ত্রণাহীন, দীর্ঘদিন জীবনযাপন করা সম্ভব হয়েছে। তবে দুঃখের কথা এই, যে সমস্ত রোগী পেয়েছি আধুনিক চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে তারা এসেছিল। তবে স্তন ক্যাসারের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য পেয়েছি। ■

স্বর্গীয় আগমনী বসাক

প্রয়াণ : ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, বুধবার, দুপুর ২:১৫ মিনিট
প্রয়াণকালে বয়স ৭৬ বছর
আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, বৃহস্পতিবার আদ্যশ্রাদ্ধ
স্থান : সমুদ্রগড়, বর্ধমান

শুভানুধ্যায়ী সকলকে জানাই আমন্ত্রণ

তোমার পথই আমাদের দিশা

সৌজন্যে

বসাক কনসার্ন

(পাইকারী তাঁত শাড়ি বিক্রেতা)

সমুদ্রগড়, পো : নসরৎপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৫১৯

পুত্রগণ

শ্রীশংকর বসাক : ৯০০২৩৫৭৭৮৮, **শ্রীরণজিৎ বসাক** : ৯৯৩২৪৮৬১৯৫
শ্রী সন্তোষ বসাক : ৯৭৩২২২৫৫৯৮

সমাবেশ সমাচার

ভগিনী নিবেদিতা সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির পদযাত্রা

গত ২৮ জানুয়ারি ভগিনী নিবেদিতা সার্ধশতবর্ষ উদযাপন সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো একটি পদযাত্রা। নিবেদিতার প্রথম ভারত আগমনের দিনটিকে স্মরণ করতেই এই উদ্যোগ। স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রী-সহ বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণকারী প্রায় ৩০০ জন মহিলার সমন্বয়ে পদযাত্রাটি দক্ষিণ কলকাতা রাসবিহারী অ্যাভিনুস্থিত ত্রিকোণপার্ক থেকে সকাল সাড়ে ১০টায় যাত্রা করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় বালিগঞ্জে সমাপ্ত হয়। সমবেত শঙ্খধ্বনি, ভগিনী নিবেদিতা স্মরণে ভাষ্যপাঠ ও সঙ্গীত পথচলা মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোভাযাত্রায় ভগিনী নিবেদিতা কল্পিত বজ্রচিহ্নিত ভারতের পতাকাটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সংলগ্ন শ্রীনাথ রায় সভাকক্ষে কার্যসূচির দ্বিতীয়বর্ষে ছিল একটি আলোচনা সভা। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হৃদয়পুর প্রণবকন্যা আশ্রমের যুগ্ম সম্পাদিকা দিব্যানন্দময়ী মা, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ শরদরেণুজী এবং ভিক্টোরিয়া কলেজের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা ড. পর্ণশর্বরী ভট্টাচার্য।

সভায় কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী রুম্মা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ভগিনী নিবেদিতা ভাবনায় সমর্পিত একটি সঙ্গীত ও সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের কণ্ঠের সমবেত সঙ্গীত অনুষ্ঠানটিকে ভিন্ন মাত্রা দেয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিবেদিতার জন্মসার্ধশতবর্ষে গঠিত এই সমিতিতে শুভানুধ্যায়ী হিসাবে চেয়ারম্যান উইমেনস কমিশন সুনন্দা মুখার্জী, ডাঃ দীপান্বিতা মুখার্জী, অধ্যাপিকা ড. জয়শ্রী মিত্র, সাংবাদিক কৃষ্ণা সিনহা, নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়, অমিতা দত্ত, অলকা কানুগো ও সমাজ সেবিকা মিতালী ভট্টাচার্য এবং স্বাগতা দাসমুখার্জী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধার বার্ষিক অনুদানী সম্মেলন

গত ১৫ জানুয়ারি শ্রদ্ধার ৭ম বার্ষিক অনুদানী সম্মেলন সিউড়ী সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন সাহিত্যিক ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী। শ্রদ্ধার সভাপতি নিরঞ্জন হালদার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন, শ্রীমতী কাকলী দাস ও শ্রীমতী বনানী চৌধুরী।

শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সভাপতির ভাষণ ও রাষ্ট্র বন্দনা দিয়ে ঠিক ২টার সময় অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সহ-সম্পাদক ও প্রাক্তন সৈনিক জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিউড়ী বেণীমাধব উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

মালদায় ছাত্রাবাস উদ্‌ঘাটন

গত ১ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলার বনবাসী অধ্যুষিত ব্লক হবিবপুরের কেন্দপুকুর এলকায় বোদরা গ্রামে নবরূপে উদ্‌ঘাটন হয় 'স্বর্গীয় কর্ণমণি দেবী ছাত্রাবাস'। অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দপুকুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ গুপ্তা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক গৌতম সরকার। শ্রী সরকার বলেন, 'অশোক সিংহল বহুমুখী সেবা প্রকল্প'-এর তত্ত্বাবধানে বোদরায় --- (১) একটি শিশুমন্দির, (২) একটি ছাত্রাবাস, (৩) একটি গোপালন কেন্দ্র, (৪) সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ কেন্দ্র এবং(৫) একটি শিবমন্দির রয়েছে। আগামীতে জৈবিক কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আরোগ্য মিত্র যোজনা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পঞ্চগব্য দ্রব্যাদি বিক্রয় কেন্দ্র এবং পর্যটকদের জন্য অতিথিশালা করার পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বোদরার এই সেবাকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে এলাকায় ধর্মান্তরণ বন্ধ হয়েছে। বনবাসী সমাজের মানুষ স্বাভিমানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছে। অনুষ্ঠানে শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিষদের মালদা জেলা সম্পাদক গোপাল কুণ্ডু। ধন্যবাদ জানান চন্দন মুর্মু।

ছাতনী শিশু মন্দিরে সহভোজন

গত ২৬ ও ২৮ জানুয়ারি বর্ধমান জেলার ছাতনীর সরস্বতী শিশু মন্দিরে উৎসাহ

ব্যঞ্জকভাবে পারিবারিক সহভোজনের কার্যক্রম হয়। প্রথম দিনে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রমে ৬০ জন মা-সহ ১৮২ জন ভাই-বোন উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে ২১ জন মা-সহ ২৯৮ জন উপস্থিত ছিলেন। উভয় দিনেই পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র উপস্থিত থেকে পরিবারের সমৃদ্ধির দিশা নির্দেশ করেন।

মঙ্গলনিধি

গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের পূর্বভাগ কার্যবাহ সুব্রত নস্করের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন তাঁর কাকা শঙ্কর নস্কর। সমাজ সেবা ভারতীর পক্ষে মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সম্পর্কপ্রমুখ তথা প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য শক্তিশেখর দাস। শ্রীদাস সবার সামনে মঙ্গলনিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

মালদা জেলার কালিয়াচক মহকুমার কৃষ্ণপুর শাখার স্বয়ংসেবক কিশোর সরকার গত ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর কন্যা অনুষ্কার মুখেভাত উপলক্ষে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী কুমার সরকারের হাতে। অনুষ্ঠানে মালদা বিভাগ প্রচারক ধনেশ্বর মণ্ডল ও জেলা প্রচারক মলয় দত্ত-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৬ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ খণ্ডের মাঝিনা শাখার স্বয়ংসেবক মৃত্যুঞ্জয় রায়ের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা জীতেন্দ্রনাথ রায় ও মা শ্রীমতী সুমিতা রায় নববধূ তনুশ্রী রায়ের হাত দিয়ে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৭ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলার পুরাতন মালদা খণ্ড কার্যবাহ বিট্টু চৌধুরীর শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন উত্তরবঙ্গ সহ-প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরীর হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা প্রচারক মলয় দত্ত-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিজয়গড়ের কার্যকর্তা তথা স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধি বাদল মণ্ডল তাঁর একমাত্র কন্যা সুপর্ণার শুভবিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন সমাজ সেবা ভারতীর কার্যকর্তার হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ প্রচারক প্রদীপ দে, কলকাতা দক্ষিণ বিভাগ প্রচারক সুদীপ তেওয়ারী, দক্ষিণ ভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

গত ৬ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ বীরভূম জেলার শ্রীনিকেতন (বোলপুর) খণ্ড কার্যবাহ প্রণব মণ্ডলের ভাইঝির মুখেভাত অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর বাবা স্বাধীন মণ্ডল বিভাগ প্রচারক উত্তম মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কার্যবাহ সুপ্রিয় চ্যাটার্জী, জেলা সেবা প্রমুখ প্রসেনজিৎ মণ্ডল-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

শোকসংবাদ

কলকাতার টালিগঞ্জ শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক জগদীশ চন্দ্র ব্যানার্জী গত ৩১ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাত ১১-৪৫ মিনিটে এন. আর. এস হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। টালিগঞ্জ পশ্চিম পুটিয়ারী এলাকায় তিনি সর্বজন প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় জগাইদা নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৫০ সালে দাদাদের সঙ্গে শিশুকালেই উল্টাডাঙ্গা শাখায় যোগ দেন। আমৃত্যু নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক এবং বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। নিজের ওয়ার্ডের বিজেপির সভাপতিও ছিলেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। লিলুয়ার বিখ্যাত আগরওয়াল হার্ডওয়ার ফ্যাক্টরির ফোরম্যান হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পরে এলাকার পঞ্চাননতলার শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে পূজারির কাজ করতেন। সেই সুবাদে এলাকায় সর্বজন পরিচিত ছিলেন। হাসপাতালে মৃত্যুকালে তাঁর সুপুত্র শান্তনু ব্যানার্জী হাসপাতালেরই বাজি পোড়াতে গিয়ে দু-চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়া এক গরিব বালিকার জন্য পিতার চক্ষু দান করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর। প্রাক্তন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জীর তিনি পঞ্চম ভ্রাতা। উল্লেখ থাকে যে, ১০ দিনের ব্যবধানে রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জীর দুই ভাই স্বর্গত হলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, আত্মীয় পরিজন এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক নিরাপদ পালের মাতৃদেবী সরস্বতী পাল গত ২ ফেব্রুয়ারি ১৭ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা এবং নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। উলুবেড়িয়া অঞ্চলে সঙ্ঘের কাজের বিস্তারে তাঁর পরিবারের অবদান স্মরণযোগ্য। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

* * *

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া খলিশানী শাখার স্বয়ংসেবক বিপ্লব দাস ও বিপুলকান্তি দাসের মা শান্তিলতা দাস গত ১৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্ধমান বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ সন্তোষ বসাকের মাতৃদেবী আগমনী বসাক গত ১ ফেব্রুয়ারি সমুদ্রগড়ের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর মেজপুত্র রণজিৎ বসাক কাটোয়া জেলার কুটুম্বপ্রবোধন প্রমুখের দায়িত্ব পালন করছেন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে উজ্জ্বল বৃদ্ধতন্ত্ররাজ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

'ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট ফর্ম টেমপোরারি।' এ বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল এই প্রবাদবাক্যটিকে যথাযথ মান্যতা দিতে। পুরুষ ও মহিলা বিভাগের আটজনের মধ্যে ছয় সেমিফাইনালিস্টই ছিলেন 'ওটি' অর্থাৎ ওভার থার্টি এজগ্রুপের। আর ফাইনালে যে চারজন খেলেছেন তাদের মিলিত বয়স একশো চল্লিশ। তাহলে কী করে বলা যাবে টেনিস কোর্ট হচ্ছে তরুণ-তুর্কীদের মৃগয়া ক্ষেত্র। বিশ্বের সব দেশে সব খেলায় যেখানে যৌবন তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে থাকা ছেলেমেয়েদের দাপাদাপি, সেখানে যতদিন যাচ্ছে ততই যেন রজার ফেডেরার, সেরেনা উইলিয়ামস উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এই দুই চ্যাম্পিয়ন যেভাবে খেলেছেন, তাতে বাকি তিন গ্র্যান্ডস্লামেও অনেক রথী-মহারথী বধ হবেন তাঁদের হাতে, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মেলবোর্নে পুরুষ সিঙ্গলস ফাইনালটি ছিল সব অর্থেই মহাকাব্যিক ও অতি নাটকীয় উপাদানে ভরপুর। পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াইটি গোটা দুনিয়াকে তিন ঘণ্টার জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিল। 'ফেডেরার দ্য কিং' এই ৩৬ বছর বয়সেও ঘণ্টায় ১৪০ মাইল বেগে সার্ভিস করেছেন। প্রায় প্রতিটি সার্ভিস নিখুঁত হয়েছে। 'এস' মেরেছেন ৩০টি। উল্টোদিকে ছিলেন আর এক 'গ্রেট মাস্টার।' সেই রাফায়েল নাদালকে মাঝে মধ্যেই বড় অসহায় লেগেছে ফেডেরারের শক্তিশালী সার্ভিস, ডাউন দ্য লাইন রিটার্ন এবং ক্রস কোর্ট পাসিং শটের সামনে। অল কোর্ট টেনিস খেলে চমকে দিয়েছেন কিংবদন্তী টেনিস খেলোয়াড় থেকে টিভি ও রেডিও ভাষ্যকারদের। নাদালও সময়বিশেষে বেশ কিছু বিষাক্ত টপ স্পিন ব্যাকহ্যান্ড ক্রস কোর্ট এবং চিপ অ্যান্ড চার্জ ভলি মেরেছেন, যা দেখে স্বর্ণযুগের নাদালকে মনে পড়ে যাচ্ছিল। ফাইনালে জকোভিচ, মারে বা ওয়ারিঙ্গা উঠলে এত চমৎকার দ্বৈরথ দেখা যেত কিনা সন্দেহ। এই দ্বৈরথটা নাদাল-ফেডেরারের মধ্যে হয়ে থাকে সাধারণত।

রজার ফেডেরার

অন্যদিকে দুই বোনের ফাইনালটা এক প্রকার একপেশেই হয়েছে। সেরেনা সারাক্ষণ দাপট দেখিয়ে খেলে দিদি ভেনাসকে এতটুকু জমি দেয়নি লড়াইয়ে ফেরার। সেরেনার শক্তিশালী সার্ভ-ভলি গেমের কোনো জবাব ছিল না ভেনাসের র‍্যাকেটে। তবে আট বছর পর গ্র্যান্ডস্লাম টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলাটাও কম কৃতিত্বের নয়। ট্যুর সার্কিটতো ভেনাসকে বাতিলের দলেই ফেলে দিয়েছিল। ডব্লুউটিএ এবং গ্র্যান্ডস্লাম সব ইভেন্টেই সাম্প্রতিককালে কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই বিদায় অবশ্যম্ভাবী ছিল যাঁর, সেই খেলোয়াড় বা নিজের চেয়ে র‍্যাঙ্কিঙে অনেক এগিয়ে থাকা টগবগে আত্মপ্রত্যয়ী কমবয়সি মেয়েদের চ্যালেঞ্জকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ফাইনাল খেলে ফেলবেন, একথা অতি বড় টেনিস-পণ্ডিতও স্বপ্নে কল্পনা করেননি। এই রানার্স আপ খেতাবটা ভেনাসকে আগামী সব ইভেন্টে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে।

সেরেনার সামনে এখন শুধু মার্গারেট কোর্ট। তাঁরই নামাঙ্কিত কোর্টে ২৩তম গ্র্যান্ডস্লাম সিঙ্গলস খেতাবটি জিতে কোর্টের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট কোর্ট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিস এভার্ট যিনি চ্যানেল নাইনের হয়ে ধারাভাষ্য দিয়েছেন, বলেই ফেলেছেন সর্বকালের নিরিখে সেরা মহিলা খেলোয়াড় আর কেউ নন, সেরেনা উইলিয়ামসই। সিঙ্গলস ডাবলস মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি খেতাব জিতেছেন চেক প্রজাতন্ত্রের মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, যিনি পরে মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করে পাকাপাকি সেখানে বসবাস করছেন।

সেরেনা উইলিয়ামস

তবে রজার ফেডেরারের সামনে আর কেউ নেই। আর এক কিংবদন্তী অস্ট্রেলিয়ান রয় এমার্সনের সঙ্গে এক আসনে পাঁচ বছর বসে ছিলেন। দুজনেই এই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে পর্যন্ত ১৭ টি গ্র্যান্ডস্লামের মালিক ছিলেন। ফেডেরার এখন ১৮টি খেতাবের মালিক। অদূর ভবিষ্যতে তাকে টপকে যেতে পারেন কিনা জকোভিচ বা তাদের মধ্যে কেউ, তার দিকেই তাকিয়ে থাকবে টেনিস দুনিয়া। নাদালের পক্ষে ১৮টি খেতাব জেতা বোধহয় কঠিন হবে। যদিও ইতিমধ্যেই ১৪টি খেতাব জেতা হয়ে গেছে তার। কিন্তু চোট-আঘাত যেভাবে নাদালকে ভোগাচ্ছে তাতে এই রেকর্ড ভাঙা নাদালের পক্ষে অনেকটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। আর এই 'সুপার ক্যাব ফোরের' বাইরে স্ট্যার্ন ওয়ারিঙ্গা উইলফ্রেড সাঙ্গা, টমাস বার্ভিচরা মাঝে মধ্যে গ্রান্ডস্লাম জিতলেও 'অলটাইম রেকর্ড ব্রেকার' হবেন না।

শব্দরূপ-৮২৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

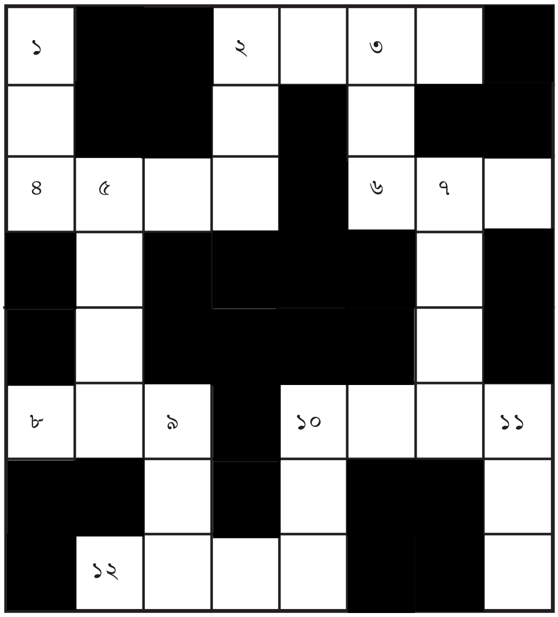

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. শ্রীকৃষ্ণের পত্নীবিশেষ, ৪. ওড়িশার নীলগিরি পর্বতমালা, জগন্নাথক্ষেত্র, ৬. গর্দভ; প্রথম দুয়ে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যলীলা, ৮. হিমালয়পত্নী; শকুন্তলার জননী, **১০**. বিষ্ণু ও শিব, **১২**. এতে মই দেওয়া মানে সবকিছু পণ্ড।

উপর-নীচ : **১**. 'ভাঁড়ে মা—' ২. সঙ্গতিপন্ন, ৩. সাধু সন্ন্যাসীদের রসদ, অন্নসত্র, ৫. লক্ষবার বহ্নিতে দহন করে শুদ্ধ, ৭. সত্য বা ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও দুঃখবরণ, ৯. শ্লোকময় ব্যাখ্যাপুস্তক; কর্মকর্ত্রী, **১০**. হোম, **১১**. ছারপোকা।

সমাধান
শব্দরূপ-৮২০

পি	■	■	র	ত্না	ক	র	■
ল	■	■	ক্ষ	■	ল্প	■	■
পা	দো	দ	ক	■	ত	■	■
■	তা	■	■	মা	রু	তি	■
■	রা	জ	ন্য	■	■	হা	■
■	■	য়	■	বি	শা	র	দ
■	■	দে	■	ভূ	■	■	ধী
■	ভ	ব	ভূ	তি	■	■	চি

সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
তাঁতিবেড়িয়া, হাওড়া
সঞ্জয় পাল
সাহাপুর, মালদা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৮২৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৩ মার্চ ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
ডাটা
গুঁড়ো মশলা
থাকে যদি ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
TURMERIC POWDER
CUMIN POWDER
Curry Powder
RED CHILLI POWDER
CORIANDER POWDER
Pure Indian Spices
fssai
Lic. No.
12812019005087
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কোলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২২৫৯ ০৮৬৩/১৭৯৬/৪১১২/৫৫৪৮
email : dutaspice@gmail.com
website : www.dutaspices.com

মালদায় হিমঘরে আলু রাখা নিয়ে কৃষকদের ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। চলতি মরশুমে মালদায় হিমঘরে আলু রাখার বন্ড পেতে কৃষকদের হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। মালদায় সিটকামহলে ১টি, আদিনা স্টেশনে ১টি, কালুয়াদীঘিতে ২টি, নারায়ণপুর মিশন রোডে ২টি এবং সামসীতে ১টি হিমঘর আছে। হিমঘরের মালিকরা আলুচাষিদের পাত্তা না দিয়ে দালাল, বড় আড়তদার বা মজুতদারদের জন্য বন্ড সংরক্ষিত রাখছে। এ মরশুমে আলুর বীজ হিমঘরে না রাখতে পারলে আগামী বছরে কৃষকরা চাহিদা মতো আলুচাষ করতে পারবে না। কিছুদিন আগে ফিনিক্স হিমঘরে বন্ড দেওয়ার খবর প্রচার হতেই জেলায় চাষিরা ভিড় জমান। কেউ কেউ সারারাত ধরে হিমঘরের গেটের কাছে ধরনা দিয়ে বসেছিলেন সকালে। কর্তৃপক্ষ বলে ভোটার কার্ডের জেরক্স বাইরে থেকে ছুড়ে জমা দিতে। সেই মতো সকলে হুড়াহুড়ি করে জমা দেয়। পদ্মা হিমঘরেও বন্ড দেওয়ার খবরে সেখানেও চাষিরা বন্ডের জন্য ছুটে যায়। কিন্তু অর্ধেক চাষির কাগজ জমা হতে না হতেই গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। শেষে ২৭ জানুয়ারি চাষিরা আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। শুরু হয় ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ছুটে এসে আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। বলা হয় পরের দিন বিডিও অফিসে কৃষকদের বন্ড দেওয়া হবে। চাষিদের দাবি হলো, মা-মাটি-মানুষের সরকার কৃষকদের স্বার্থের কথা না ভেবে আড়তদার, মজুতদার ও দালালদের কথাই আগে ভাবছে।

আন্দামানে ২৪০ কিলোমিটার রেলপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পোর্টব্লেয়ার থেকে ডিগলিপুর। দূরত্ব ২৪০ কিলোমিটার। আন্দামানের দুই গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ-শহরকে জুড়তে বসবে রেললাইন। সমুদ্রের ধার ঘেঁসে তৈরি হবে ব্রিজ, স্টেশন। এই ধরনের প্রকল্প আন্দামানে এই প্রথম। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির রাজধানী এবং উত্তর আন্দামানের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর পোর্টব্লেয়ারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে রেলমন্ত্রকের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। আগে পোর্টব্লেয়ার থেকে ডিগলিপুর যেতে বাসে লাগত ১৪ ঘণ্টা, জাহাজে একটা গোটা দিন। বিমান যোগাযোগ ছিল না। রেলমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই প্রকল্পে লাইন বসাতে খরচ পড়বে ২৪১৩.৬৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আন্দামানে বেড়াতে আসা পর্যটকদের সংখ্যা আরও বাড়ানো। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজ্যপাল জগদীশ মুখী বলেন, 'ট্রেন চলাচল শুরু হয়ে গেলে আন্দামানের এখনকার গড় পর্যটক সংখ্যা ৪.৫ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষে পৌঁছে যাবে।' পর্যটন ব্যবসার পাশাপাশি আরও একটি বিশেষ কারণে এই রেলপথ তৈরি করা হচ্ছে। কারণটি প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত। মিয়ানমারের দক্ষিণ সমুদ্রসীমা থেকে ডিগলিপুরের দূরত্ব মাত্র ৩০০ কিলোমিটার। তাই মেনল্যান্ড আন্দামানের সঙ্গে ডিগলিপুরের যোগাযোগ প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশেষ গুরত্বপূর্ণ।

বাংলায় ধর্মীয় সংঘর্ষের বিপজ্জনক বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত কয়েকবছরে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় সংঘর্ষ মারাত্মক ভাবে বেড়ে গেছে। ২০১৪ সালে যেখানে ১৬টি ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে ২০১৬ সালে ঘটেছে ৩২টি ঘটনা। মৃতের সংখ্যা সেভাবে না বাড়লেও, বেড়েছে আহতের সংখ্যা। এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু সম্প্রতি এই তথ্য দিয়েছেন। জানা গেছে, ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি সংঘর্ষে ৬ জন মারা গেছেন, আহত হয়েছেন ৩২ জন। ২০১৫-তে সংঘর্ষ হয় ২৭টি। ৫জন মারা যান, আহত হন ৮৪ জন। ২০১৬-তে ধর্মীয় সংঘর্ষ হয়েছে ৩২টি। তাতে ৪ জন মারা গেছেন, আহত হয়েছেন ২৫২ জন। ভারতের অন্য কয়েকটি রাজ্যেও ধর্মীয় সংঘর্ষের ঘটনা গত তিনবছরে ঘটেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো সংখ্যায় এমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কোথায়ও হয়নি। সেটাই সব থেকে উদ্বেগের বিষয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন কিরেন রিজিজু।

পঞ্চগব্যের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নে কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যৌক্তিকতা নিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি মহলে প্রশ্ন ওঠায় কেন্দ্র সরকার তা পর্যালোচনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত এই কমিটি গোরুর গোবর ও মূত্রে রোগ প্রতিষেধকের ক্ষমতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে। বৈজ্ঞানিক সত্যতা বিচারের জন্য একটি ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি পঞ্চগব্যের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা আছে কিনা তারও মূল্যায়ন করবে। কেন্দ্রের এই প্রকল্পটি সংযোজক হিসেবে দিল্লির আই আই টি-র সেন্ট্রাল ফর রুরাল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি (সি আর ডি টি) কাজ করবে। সি আর ডি টি-র প্রধান অধ্যাপক বীরেন্দ্রকুমার বিজয় জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রক নিযুক্ত স্টিয়ারিং কমিটি খুব শীঘ্রই পঞ্চগব্যের যাথার্থতা নিয়ে পর্যালোচনা করবে। সংসদের বাজেট অধিবেশনে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ওয়াই এস চৌধুরী গত ৮ ফেব্রুয়ারি এক প্রশ্নের জবাবের প্রসঙ্গে বিষয়টি উঠে এসেছে। এই খাতে বাজেটে নির্দিষ্ট কোনো অর্থ বরাদ্দ করা না হলেও তা বর্তমান গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্য থেকেই করা হবে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
20 February - 2017 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০ টাকা।।